পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - বরুন রেজ
স্ক্যান করেছেন - বরুন রেজ
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

dhulokhela@gmail.com

শিশুসাথীর নিয়মাবলী

১। শিশুসাথীর চাঁদা অগ্রিম দিতে হয়। চাঁদা (সডাক) : বার্ষিক—৬·০০, ষাণ্মাসিক—৩·০০। প্রতি সংখ্যা ·৬০ নয়া পয়সা। **চাঁদার টাকা—"বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড ৫নং বংকিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২"—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।**

২। **শিশুসাথীর বর্ষ বৈশাখ মাস হইতে আরম্ভ হয়।** যে কোন সময়ে টাকা পাঠাইয়া বৈশাখ অথবা অন্য যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। কোন্ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইবেন, মনি-অর্ডার কুপনে বা পত্রে তাহা উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন।

৩। **পত্রিকার মোড়কে হাতে লেখা গ্রাহক-নম্বর দেওয়া থাকে।** পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠায় ছাপা নম্বর গ্রাহক নম্বর নহে।

৪। প্রতি মাসের ১লা তারিখের মধ্যেই সমস্ত গ্রাহক-গ্রাহিকার পত্রিকা ডাকে পাঠান হয়। ১০ই তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে, স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার মহাশয়ের দ্বারা কারণ লিখাইয়া ১৫ই তারিখের মধ্যে চিঠি লিখিলে পুনরায় পত্রিকা পাঠান হয়। দুই এক মাস পরে জানাইলে পত্রিকা পাঠান হয় না।

৫। বেশির ভাগ সংখ্যা যদি হারাইয়া যায়, তবে প্রত্যেকটি সংখ্যার জন্য ·৬০ নয়া পয়সা হিসাবে মূল্য ও রেজেষ্ট্রী করিবার খরচ মনি-অর্ডার করিয়া পাঠাইলে রেজিষ্টার্ড পোষ্টে পাঠান হইবে। কাহাকেও একই সংখ্যা বার বার পাঠান হয় না।

৬। গ্রাহকেরা প্রত্যেক চিঠি-পত্রে **নাম, সম্পূর্ণ ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর অবশ্য উল্লেখ করিবেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে ২০শে তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে।

৭। **লেখক-লেখিকা** এবং **গ্রাহক-গ্রাহিকাদের** লেখা, তাঁহাদের তোলা ফটো এবং আঁকা ছবি সম্পাদিকার মনোনীত হইলে প্রকাশ করা হয়; তবে যে-কোন লেখা বা ছবি কোন্ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে, তাহা বলা একেবারেই সম্ভব নয়। **লেখা বা ছবির সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকেট না পাঠাইলে ফলাফল জানান হয় না। লেখা সর্ব্বদা নকল রাখিয়া পাঠান দরকার,** কারণ অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়। **কবিতা ফেরত দিবার ব্যবস্থা নাই।** যে-কোন লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া পাঠাইতে হইবে এবং খামের উপর বিভাগের নাম লিখিয়া দিলে সুবিধা হইবে। "শিশুসাথী" সম্বন্ধে যে-কোন বিষয় জানিতে হইলে রিপ্লাই কার্ড বা উপযুক্ত ডাক-টিকেট সহ পত্র লিখিতে হইবে।

কর্মাধ্যক্ষ, **'শিশুসাথী'**; ৫, বংকিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা : ১২

ফোন : ৩৪-১৫৬৪

ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক সমগ্র প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

৪৬শ বর্ষ
৯ম সংখ্যা

প্রতিষ্ঠিত বাং ১৩২৯ সাল ; ইং ১৯২২ সন

শিশুসাথী

পৌষ
১৩৭৪

বার্ষিক মূল্য ৬৲ টাকা]

সূচী

[প্রতি সংখ্যা ৬০ পয়সা

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১।	যিশুকে (কবিতা)	শ্রীরূপক রায়	৫২১
২।	উত্তরাধিকারী	শ্রীঅতীন মজুমদার	৫২২
৩।	বিজ্ঞানী মাদাম কুরী	শ্রীরাজলক্ষ্মী দাশগুপ্ত	৫২৭
৪।	আর্থারের তলোয়ার	শ্রীচিত্ত ঘোষাল	৫৩৩
৫।	স্বপ্ন-ভেজা দিন (কবিতা)	শ্রীপ্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	৫৩৭
৬।	কিম্ভূতের পুঁথি	শ্রীআশাপূর্ণা দেবী	৫৩৮
৭।	প্রাচীন বিশ্ব-বিস্ময়	শ্রীগোলোকেন্দু ঘোষ	৫৪৯

শিশুদিগের যকৃৎ রোগে উপকারী

সুস্থ শিশুকেও মধ্যে মধ্যে কালমেঘ সেবন করাইলে লিভারের দোষ হইবার সম্ভাবনা থাকে না

বেঙ্গল কেমিক্যালের

কালমেঘ

আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মতে কালমেঘ তিক্ত, অগ্নিদীপক, বলকারক ও পিত্তনিঃসারক
ইহা আবালবৃদ্ধ সকলের পক্ষেই হিতকর

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

সূচী

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
৮।	ছড়া—ছড়া		
	(১) ফুলটুসি	শ্রীহিমকর গোস্বামী	৫৫৩
	(২) ওড়ে খুকুর মন	শ্রীপ্রণবকান্তি দাশগুপ্ত	৫৫৩
৯।	তোমাদের পাতা		
	(১) হলদিয়া ভ্রমণ	শ্রীঅদিতি মৌলিক	৫৫৪
	(২) হেমন্ত (কবিতা)	শ্রীবিভূতিভূষণ আদক	৫৫৬
১০।	রাজার গায়েন	ডাঃ বি. দে.	৫৫৭
১১।	শীতের কাপড় দে (কবিতা)	শ্রীরঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৬০
১২।	যে পথে যেখানে গেছি	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	৫৬১
১৩।	দুর্বাসার পরাজয়	শ্রীকৌশিক চট্টোপাধ্যায়	৫৭১

আমার সারাদিনের সাথী

লর্ডের জেলি, চকোলেট ও ক্রীম ভরা মনোহর লজেন্স মুখে পড়লে শরীর ও মন মিষ্টি রসে ভরে যায়। মনে হয় রোজই এক বয়াম খাই।

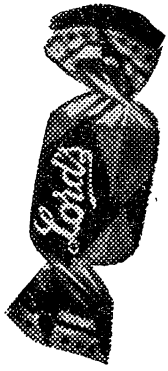

লর্ডের

লজেন্স ও টফি

জেম্‌স্ লর্ড এণ্ড সন্স লিঃ

কলিকাতা-১

Alpha-J121

সূচী

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১৪।	গঙ্গাফড়িং	শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী	৫৭৬
১৫।	বৃথা গর্ব (কবিতা)	শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস	৫৭৮
১৬।	এ যুগের রূপকথা	যাদুসম্রাট পি. সি. সরকার	৫৭৯
১৭।	শরীরচর্চার বৈঠক	বিশ্বশ্রী মনতোষ রায়	৫৮২
১৮।	খেলাধূলা	শ্রীঅমিতাভ	৫৮৪
১৯।	নতুন ধাঁধা	শ্রীরন্টু চ্যাটার্জী	৫৮৬
২০।	গত মাসের ধাঁধার উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম		৫৮৬
২১।	সম্পাদিকার চিঠি		৫৮৭

ছোটদের উপহার দেবার মতো কয়েকটি বই

হাসির বই

শিবরাম চক্রবর্তীর **হাসির গল্প** ১·৫০
নারায়ণ গাঙ্গুলীর **হাসির গল্প** ২·৫০
স্বপনবুড়োর **হাসির গল্প** ২·৫০
বিভূতি মুখোঃর **হাসির গল্প** ২·৫০
বুদ্ধদেব বসুর **হাসির গল্প** ২·০০
আশা দেবীর **হাসির গল্প** ১·৫০

ক্লাসিক

অদ্ভুত যত গল্প (ভৌতিক গল্প সংগ্রহ) ২·০০
বত্রিশ পুতুলের উপাখ্যান ৩·৫০
ছোটদের আরব্য উপন্যাস ২·৫০
দশ কুমার চরিতের গল্প ২·৫০
গল্পে কাদম্বরী ১·৫০
পুরাণের সেরা গল্প ৩·০০

নানা দেশের রূপকথা ॥ মনোরম গুহ-ঠাকুরতা ২·০০ **নীল সাগরের নীচে** ॥ ২·০০
ওয়ার অ্যাণ্ড্ পীস ॥ অশোক গুহ ২·০০ **পিকউইক পেপারস্** ॥ অশোক গুহ ॥ ২·০০
অ্যাড্ভেঞ্চার অব্ লে ভেরী ॥ বিশু মুখোপাধ্যায় ॥ ২·০০
গল্পের রাজা ক্রীলভের গল্প ॥ অনিলেন্দু চক্রবর্তী ॥ ২·০০
রবিনসন ক্রুসো ॥ অশোক গুহ ॥ ২·০০ **রবীন হুড** ॥ দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ২·০০
গালিভার্স ট্রাভেলস্ ॥ দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় ২·০০

এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং ॥ ৬।১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২। ফোঃ ৩৪-৪৩১০

শরৎ-সাহিত্য-ভবন

২৫, ভুপেন বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৪

বুদ্ধদেব বসু		ওয়ার এণ্ড পীস্	২·০০
স্বার্থপর দৈত্য	১·৭৫	ডনকুইক্সোট	২·০০
সুখী রাজপুত্র	১·৭৫	টোয়েন্টি ইয়ার্স আফটার	১·৫০
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ		থ্রী মাস্কেটিয়ার্স	১·৫০
স্নো-হোয়াইট	২·০০	কেণিল ওয়ার্থ	১·৫০
হারকিউলিস্	২·০০	বেনহুর	১·৫০
আষাঢ়ে গল্প	২·০০	ম্যাকবেথ	২·০০

প্রাপ্তিস্থান :—আশুতোষ লাইব্রেরী
৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিঃ-১২

শ্রীদুর্গা পুস্তকালয়
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ব্লক-এ, নং-২১

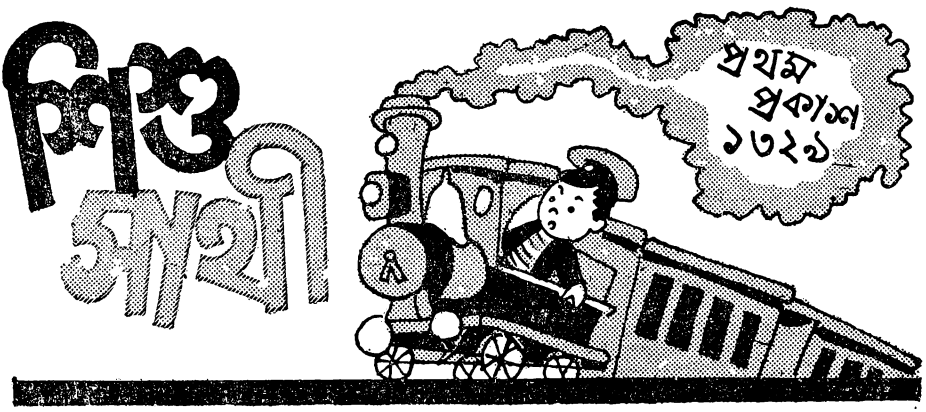

৪৬শ বর্ষ পৌষ, ১৩৭৪ ৯ম সংখ্যা

যীশুকে

শ্রীরূপক রায়

যীশু, তুমি মানবের কল্যাণের তরে, এনেছিলে, হিংসা নয়, প্রেম-ভালোবাসা,
এসেছিলে হিংসাভরা এ পৃথিবী 'পরে। হিংসায় দলিত মনে জেগেছিল আশা।
দুই চোখে ক্ষমা আর কল্যাণের বাণী হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী তবু বুঝিল না,
ছড়ায়ে দিয়েছ দূর স্বর্গ হতে আনি। তোমারে ভুলিয়া করে বিদ্বেষ সাধনা।

তব প্রেম-প্রীতিভরা জীবনের মাঝে,
এনে দিল মৃত্যুদণ্ড নির্মম নিলাজে।
তবুও বিদায়-লগ্নে হে অন্তরতম,
বলেছিলে ভগবানে—"ইহাদের ক্ষমো।"

উত্তরাধিকারী

শ্রীঅতীন মজুমদার

[প্রতি বছরই ২৫শে ডিসেম্বর দিনটিতে সারা পৃথিবীর খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা 'বড়দিন' উৎসব পালন করে থাকে। যাঁর জন্মদিন স্মরণে এই বড়দিন উৎসব, সেই বিশ্ববরেণ্য মহাপ্রেমিক যীশুখ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করেছিলেন আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগে রোমীয় সম্রাট সিজার অগাস্টাসের রাজত্বকালে প্যালেস্টাইনের একটি ছোট্ট নগর—বেৎলেহামে। রোমীয় সম্রাটের আদেশানুসারে আদমসুমারী উপলক্ষে নাজারেথ নামে একটি নগর থেকে প্রায় সত্তর মাইল পথ অতিক্রম করে এক গরীব ছুতোর যোষেফ তাঁর সন্তানসম্ভবা স্ত্রী মরিয়মকে নিয়ে বেৎলেহামে নিজেদের নাম-ধাম লেখাতে এসেছিলেন।

জনাকীর্ণ বেৎলেহামে তখন তিল ধারণের স্থান নেই। তাই পথশ্রমে ক্লান্ত যোষেফ ও মরিয়মকে এক পান্থশালার পরিত্যক্ত জীর্ণ গোশালায় আশ্রয় নিতে হয়েছিল এবং সেখানেই গভীর রাত্রে ধর্মগুরু যীশুখ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

'যীশু' কথাটির অর্থ ত্রাতা এবং 'খ্রীষ্ট' কথাটির অর্থ অভিষিক্ত। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস বিশ্বপিতার একমাত্র সন্তান যীশুখ্রীষ্ট তাঁর দ্বারাই মানুষের পাপ-দুঃখ-কষ্টের মুক্তির জন্য ত্রাতারূপে অভিষিক্ত হয়ে মানবরূপ পরিগ্রহ করে মরিয়মের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের সময়ে রোমীয় শাসনে পিষ্ট য়িহুদী জাতি তখন বিপর্যস্ত। হিংসা-লোভ-লালসা, ধর্মীয় অনাচার, আত্মকলহ তখন চরম সীমায় পৌঁছেছে। শাসকবৃন্দ, ধর্মযাজক প্রভৃতি ধর্মের নামে নিরন্তর শোষণে লিপ্ত। ঠিক সেই সময়ে যীশুখ্রীষ্ট জন্মগ্রহণ করলেন। তারপর যৌবনে পদার্পণ করে প্রচার করলেন তাঁর প্রেমের মহামন্ত্র,—তোমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাস। তোমরা সবাই অমৃতের পুত্র—তোমাদের মধ্যে কেউ ছোট বড় নও,—সবাই সমান। প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত তোমরা প্রত্যেকেই পরস্পরের ভাই,—বিশ্বপিতা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা।

যীশুখ্রীষ্টের এই সব কথা তৎকালীন ক্ষমতালোভী শাসক সম্প্রদায়ের ভাল লাগেনি। লোক-সমাজে তাঁর অপ্রতিহত প্রভাবেও তারা ভীত হয়। ফলে চক্রান্ত করে, তারা তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করে প্রকাশ্য রাজপথে হত্যা করে।

কিন্তু সেদিন তিনি মৃত্যু বরণ করেও আজও মানুষের মনে মনে বেঁচে রয়েছেন। তাঁর প্রেমের বাণী সারা পৃথিবীর মানুষকে আজও এক অপার্থিব আনন্দলোকের সন্ধান দেয়। সারাজীবন তিনি মানুষকে গল্পচ্ছলে নানা উপদেশ দিয়ে গেছেন, বাইবেলের নূতন

নিয়মে (New Testament) তা লেখা আছে। নীচের এই গল্পটি তারই একটি গল্পের ছায়া অবলম্বনে লেখা।]

শ্রেষ্ঠী বিত্তারণ্য মস্ত ধনী লোক। তাঁর হাতীশালায় হাতী, ঘোড়াশালায় ঘোড়া, উটশালায় উট—গুণে শেষ করা যায় না। অসংখ্য পণ্যবাহী তরণী, এক দেশ থেকে অন্য দেশে নিরন্তর পাড়ি দিয়ে চলেছে ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশে। কোষাগারে মণিমুক্তা, হীরা-জহরতের ছড়াছড়ি। প্রাসাদোপম বিরাট অট্টালিকা আগাগোড়া শ্বেত-পাথরে তৈরী। চত্বরে চত্বরে, খিলানে খিলানে তার অপরূপ কারুকার্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়।

বিত্তারণ্যের অসংখ্য দাস-দাসী। সব সময়েই তারা কাজে ব্যস্ত। এতটুকু ফাঁক নেই, ফাঁকি নেই। বিত্তারণ্য খুবই সদাশয় লোক। অযথা কারুকে কষ্ট দেন না, দেন না কারুর মনে এতটুকু দুঃখ। তাঁর দাস-দাসীরা তাই প্রত্যেকেই তাঁকে খুবই ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। তিনিও তাদের প্রত্যেককেই সমান চোখে দেখেন। তাদের এতটুকু দুঃখ-কষ্ট দেখলে তখনই তার প্রতিকারের চেষ্টা করেন।

এ হেন সদাশয় শ্রেষ্ঠী বিত্তারণ্যের মন আজ ক'দিন ধরে চিন্তাকুল। তাঁর তিন ছেলে—হীরক, কাঞ্চন ও রূপক। ছেলেরা তাঁর এই বিরাট সম্পত্তি, সঞ্চিত ধনরত্ন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য যথাযথভাবে রক্ষা করতে পারবে কিনা, সেই চিন্তাই শয়নে-স্বপনে তাঁর মনকে অশান্ত করে তুলেছে।

শেষে অনেক ভেবে, একদিন তিন ছেলেকে কাছে ডেকে বললেন: আমি দীর্ঘ দিনের জন্য বিদেশভ্রমণে যাব। তোমরা আমার যাত্রার আয়োজন কর।

তিন ছেলেই পিতার বিদেশভ্রমণের আয়োজনে লেগে গেল। তারা হাতীশালা থেকে সবচেয়ে ভালো হাতীটাকে এনে সুন্দর করে সাজাল। উটশালা থেকে সবচেয়ে বলিষ্ঠ উটটাকে এনে তাতে বোঝাই করল বিদেশভ্রমণের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য-সামগ্রী। পুরোহিত ডেকে যাত্রার শুভ দিন-ক্ষণ স্থির করল। তারপর পিতাকে জানাল।

নির্দিষ্ট দিনে বিত্তারণ্য বিদেশভ্রমণে বের হবেন। তাঁকে বিদায়-অভ্যর্থনা জানাতে তাঁর তিন ছেলে, আত্মীয়-স্বজন, শুভার্থী বন্ধু-বান্ধব ও দাস-দাসীরা যথাস্থানে এসে উপস্থিত হয়েছে। বিদায়ের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বিত্তারণ্য তিন ছেলেকে সস্নেহে কাছে ডাকলেন। তাদের প্রত্যেককে একটি করে ছোট কাঠের কৌটো দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তারপর উপস্থিত প্রত্যেককে তাদের সহৃদয় অভ্যর্থনার জন্য হাসিমুখে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদেশ অভিমুখে রওনা হলেন।

উপস্থিত সকলে চলে যাবার পর, তিন ছেলে কৌতূহলী হয়ে প্রত্যেকেই পিতার দেওয়া কাঠের কৌটো খুলে দেখতে পেল, তাতে পিতার স্বাক্ষরিত একটি পত্র এবং কিছু ধন

নিয়মে (New Testament) তা লেখা আছে। নীচের এই গল্পটি তারই একটি গল্পের ছায়া অবলম্বনে লেখা।]

শ্রেষ্ঠী বিত্তারণ্য মস্ত ধনী লোক। তাঁর হাতীশালায় হাতী, ঘোড়াশালায় ঘোড়া, উটশালায় উট—গুণে শেষ করা যায় না। অসংখ্য পণ্যবাহী তরণী, এক দেশ থেকে অন্য দেশে নিরন্তর পাড়ি দিয়ে চলেছে ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশে। কোষাগারে মণিমুক্তা, হীরা-জহরতের ছড়াছড়ি। প্রাসাদোপম বিরাট অট্টালিকা আগাগোড়া শ্বেত-পাথরে তৈরী। চত্বরে চত্বরে, খিলানে খিলানে তার অপরূপ কারুকার্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়।

বিত্তারণ্যের অসংখ্য দাস-দাসী। সব সময়েই তারা কাজে ব্যস্ত। এতটুকু ফাঁক নেই, ফাঁকি নেই। বিত্তারণ্য খুবই সদাশয় লোক। অযথা কারুকে কষ্ট দেন না, দেন না কারুর মনে এতটুকু দুঃখ। তাঁর দাস-দাসীরা তাই প্রত্যেকেই তাঁকে খুবই ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। তিনিও তাদের প্রত্যেককেই সমান চোখে দেখেন। তাদের এতটুকু দুঃখ-কষ্ট দেখলে তখনই তার প্রতিকারের চেষ্টা করেন।

এ হেন সদাশয় শ্রেষ্ঠী বিত্তারণ্যের মন আজ ক'দিন ধরে চিন্তাকুল। তাঁর তিন ছেলে—হীরক, কাঞ্চন ও রূপক। ছেলেরা তাঁর এই বিরাট সম্পত্তি, সঞ্চিত ধনরত্ন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য যথাযথভাবে রক্ষা করতে পারবে কিনা, সেই চিন্তাই শয়নে-স্বপনে তাঁর মনকে অশান্ত করে তুলেছে।

শেষে অনেক ভেবে, একদিন তিন ছেলেকে কাছে ডেকে বললেন: আমি দীর্ঘ দিনের জন্য বিদেশভ্রমণে যাব। তোমরা আমার যাত্রার আয়োজন কর।

তিন ছেলেই পিতার বিদেশভ্রমণের আয়োজনে লেগে গেল। তারা হাতীশালা থেকে সবচেয়ে ভালো হাতীটাকে এনে সুন্দর করে সাজাল। উটশালা থেকে সবচেয়ে বলিষ্ঠ উটটাকে এনে তাতে বোঝাই করল বিদেশভ্রমণের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য-সামগ্রী। পুরোহিত ডেকে যাত্রার শুভ দিন-ক্ষণ স্থির করল। তারপর পিতাকে জানাল।

নির্দিষ্ট দিনে বিত্তারণ্য বিদেশভ্রমণে বের হবেন। তাঁকে বিদায়-অভ্যর্থনা জানাতে তাঁর তিন ছেলে, আত্মীয়-স্বজন, শুভার্থী বন্ধু-বান্ধব ও দাস-দাসীরা যথাস্থানে এসে উপস্থিত হয়েছে। বিদায়ের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বিত্তারণ্য তিন ছেলেকে সস্নেহে কাছে ডাকলেন। তাদের প্রত্যেককে একটি করে ছোট কাঠের কৌটো দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তারপর উপস্থিত প্রত্যেককে তাদের সহৃদয় অভ্যর্থনার জন্য হাসিমুখে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদেশ অভিমুখে রওনা হলেন।

উপস্থিত সকলে চলে যাবার পর, তিন ছেলে কৌতূহলী হয়ে প্রত্যেকেই পিতার দেওয়া কাঠের কৌটো খুলে দেখতে পেল, তাতে পিতার স্বাক্ষরিত একটি পত্র এবং কিছু ধান

আছে। পত্রটিতে লেখা আছে: আমি সাত বছর পর ফিরে এসে তোমাদের কাছ থেকে এর হিসার নেব।

দেখতে দেখতে সাতটি বছর কেটে গেল।

একদিন বিত্তারণ্য বিদেশভ্রমণ শেষ করে ফিরে এলেন। তাঁর আসার খবর পাওয়া মাত্রই দাস-দাসীরা ছুটে এসে তাঁকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাল। তিনিও তাদের প্রত্যেককে কুশল প্রশ্ন করলেন এবং বিদেশ থেকে আনা মূল্যবান সামগ্রী উপহার দিলেন। তারপর উপস্থিত দুই ছেলে হীরক ও কাঞ্চনকে দেখে তাদের সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং ছোট ছেলে রূপককে দেখতে না পেয়ে তাদের তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন।

তারা বলল: আপনি চলে যাবার পর সে তিন বছর আমাদের সঙ্গে ছিল। তারপর আমাদের না জানিয়ে একদিন কোথায় যে চলে গেল, তা আমরা বলতে পারছি না। আজ পর্যন্ত তার কোনো খবরও পাই নি।

কথাটা শুনে বিত্তারণ্য বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

আরো কিছুদিন কেটে গেল। তবু রূপকের কোনো খোঁজ-খবর নেই। চিন্তান্বিত বিত্তারণ্য শেষে একদিন তার সমস্ত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও শুভার্থীদের ডেকে পাঠালেন। দিন দিন তাঁর বয়স বেড়ে চলেছে। এবার তাঁর বিষয়-সম্পত্তির একটা ব্যবস্থা করবেন। উপযুক্ত উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে তিনি শান্তিতে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করবেন।

নির্দিষ্ট দিনে বিরাট একটি ভোজ-সভার আয়োজন হয়েছে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও দেশ-বিদেশ থেকে বহু গণ্য-মান্য অতিথিরা এসে উপস্থিত হয়েছেন। ভোজ-সভার ঠিক মাঝখানে বিত্তারণ্য বসে আছেন। তাঁর দুই পাশে দুই ছেলে—হীরক ও কাঞ্চন। তাদের মনে আনন্দ আর ধরে না। আজ থেকে পিতার এই বিরাট সম্পত্তির অংশীদার হবে তারা। তাদের দুজনের মধ্যেই তা' সমান ভাবে বণ্টন করা হবে। ছোট ভাই রূপক নিরুদ্দেশ হয়েছে, আজও তার কোনো খবর নেই। সুতরাং সে কিছুই পাবে না। সে থাকলে হয়ত এই সম্পত্তি তিন ভাগ করা হত। তাতে তাদের অংশ কিছু কমে যেত।

বিত্তারণ্য তাঁর আসন ত্যাগ করে উপস্থিত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অতিথিদের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁদের প্রত্যেককে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে, বড় ছেলে হীরককে সস্নেহে সম্বোধন করে বললেন: বৎস, আমার বিদেশভ্রমণে যাবার আগে তোমায় আমি যে একটি কাঠের কৌটো দিয়েছিলাম, সেটি আমাকে ফেরত দাও।

হীরক যেন আকাশ থেকে পড়ল—কাঠের কৌটো! তারপর তার আস্তে আস্তে মনে পড়ল,—হ্যাঁ, বিদেশভ্রমণে যাবার আগে পিতা তাদের তিনজনকেই একটি করে কাঠের কৌটো

দিয়ে যান। তার মধ্যে কিছু ধান আর একটা চিঠি ছিল বটে, আর সে কৌটোটাও সে যত্ন করে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে ধানগুলো পোকা লাগাতে পাছে কৌটোটা নষ্ট হয়ে যায়, তাই সে ধানগুলো ফেলে দিয়ে কৌটোটা তুলে রাখে। কিন্তু সে ত আজ সাত বছর আগেকার ব্যাপার। সে কৌটো কোথায় রেখেছিল, আজ কি তা মনে থাকার কথা।

হীরককে চুপ থাকতে দেখে বিত্তারণ্য আবার বললেন : কই, আমার দেওয়া কাঠের কৌটোটা ফেরত দাও।

হীরক তবুও মাথা নীচু করে চুপ করে রইল,—কোনো জবাবই দিল না।

বিত্তারণ্য এবার হীরককে ভৎর্সনা করে কঠিনকণ্ঠে বলে উঠলেন : নির্বোধ, সামান্য একটা কাঠের কৌটো আর কয়টা ধান তুমি রক্ষা করতে পারলে না? তোমায় যদি আমার এই বিরাট সম্পত্তি, সঞ্চিত ধন-রত্ন দান করি তুমি তো তা' রক্ষা করতে পারবে না। অবহেলায়, অযত্নে সমস্তই নষ্ট হয়ে যাবে—আমার সারাজীবনের পরিশ্রমের সঞ্চয় তোমার হাতে পড়ে দু'দিনেই লুপ্ত হয়ে যাবে। তুমি অবিশ্বাসী,—বিশ্বাস করে তোমায় কিছুই দেওয়া চলে না। তুমি একটি কপর্দকও পাবে না।

এই বলে তিনি তাঁর একজন দাসকে ডাকলেন এবং বড় ছেলে হীরককে দেখিয়ে বললেন : এই মুহূর্তেই একে এখান থেকে বের করে দাও।

সঙ্গে সঙ্গে একজন দাস এসে হীরককে ভোজ-সভা থেকে বের করে দিল।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। এবার বিত্তারণ্য মেজ ছেলে কাঞ্চনকে ডেকে সস্নেহে বললেন : তোমায় আমি যে কৌটোটা দিয়েছিলাম, সেটি আমায় ফেরত দাও।

কৌটোটা কাঞ্চন সঙ্গে করেই রেখেছিল। সে সেটা বিত্তারণ্যের হাতে তুলে দিল।

বিত্তারণ্য কৌটোটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বেশ ভালোভাবেই দেখলেন, তারপর সেটা খুললেন। দেখলেন, তাঁর দেওয়া সেই ধানগুলো সযত্নে রক্ষিত রয়েছে। তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল। তিনি কৌটো থেকে ধানগুলো বের করে এক এক করে ভালভাবে গুনলেন। তারপর কাঞ্চনের দিকে চেয়ে বললেন : ঠিক আছে। আমি এই পাঁচশো ধানের দানাই তোমায় দিয়ে গেছিলাম। আর তুমিও বেশ যত্ন করে সব কটাই এতদিন ধরে রক্ষা করে এসেছ।

বিত্তারণ্য কিছুক্ষণ থামলেন। তারপর এবার বেশ কঠিনকণ্ঠেই বলে উঠলেন : কিন্তু শুধু রক্ষা করাই যথেষ্ট নয়। হয়ত আরো কিছুদিন পর একদিন এগুলো নষ্ট হয়ে যেত। তোমার উচিত ছিল ধানগুলোর সদ্ব্যবহার করা—তা হলে হয়ত এই পাঁচশোটা ধান থেকে আজ তুমি আরো অনেক ধান পেতে পারতে। তুমি অলস।

পিতার কথায় কাঞ্চন মাথা নীচু করে চুপ করে রইল।

বিত্তারণ্য বললেন : সারা জীবন আমি দেশ-বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করে আজ এই বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়েছি। আজও নানা দেশে আমার নানা ব্যবসা-বাণিজ্য চলছে। এই

সম্পত্তি, এই ব্যবসা-বাণিজ্যের ভার যদি তোমার হাতে পড়ে তবে তার কোনো উন্নতিই হবে না, শুধু রক্ষা পাবে এই মাত্র। কিন্তু সম্পত্তি চিরকাল থাকে না, ব্যবসা-বাণিজ্যও চিরকাল চলে না, যদি তা রক্ষণাবেক্ষণের এবং উত্তরোত্তর উন্নতির জন্য অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা সহকারে কঠোর পরিশ্রম করা না যায়। সুতরাং তোমার মত অলসের হাতে আমার এই সম্পত্তি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। তুমিও একটি কপর্দকও পাবে না।

এই বলে তিনি একজন দাসকে ডেকে তাকেও ভোজ-সভা থেকে বের করে দেবার জন্যে আদেশ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে একজন দাস এসে বিত্তারণ্যের আদেশ পালন করল।

এবার সভায় একটা গুঞ্জন শুরু হল। সকলেই আস্তে আস্তে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে শুরু করেছে: দুই ছেলেকেই তো বিত্তারণ্য বঞ্চিত করলেন, ছোট ছেলে তো নিরুদ্দেশ, তবে কে এই সম্পত্তি পাবে?

দেখে মনে হল বিত্তারণ্যও যেন বেশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

ঠিক সেই সময়ে বাইরে থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ সকলের কানে এল—এসেছে—রূপক এসেছে!—তারপরেই দেখা গেল বিত্তারণ্যের ছোট ছেলে ভোজ-সভায় এসে ঢুকল। তার চুল উস্‌কোখুস্‌কো,—সারা মুখে ক্লান্তির ছাপ। দেখে মনে হল, সে যেন অনেক দূর থেকে আসছে—পথশ্রমে ক্লান্ত।

সে ভোজ-সভায় ঢুকে প্রথমেই বিত্তারণ্যকে প্রণাম করল। বিত্তারণ্য তাকে দেখে আনন্দে গদ্‌গদ হয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, এতদিন সে কোথায় ছিল?

রূপক জানাল—এতদিন সে দেশ-বিদেশে পিতার দেওয়া কাজেই ব্যস্ত ছিল। এই বলে সে সঙ্গে আনা অবিকল সেই কাঠের কৌটোর মত একটি কৌটো তুলে দিল বিত্তারণ্যের হাতে। আকারে সেটা তাকে দেওয়া কাঠের কৌটোর চতুর্গুণ—আর আগাগোড়া সোনা দিয়ে তৈরী।

বিত্তারণ্য সোনার কৌটোটা হাতে নিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তারপর সেটা খুলে দেখে আরো আশ্চর্য হয়ে গেলেন। দেখলেন, সেটা মোহরে ভরা। এবার তিনি মোহরগুলো বের করে এক এক করে গুণতে লাগলেন। দেখলেন, মোট পাঁচশো মোহর আছে। তাঁর চোখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এবার তিনি রূপককে বললেন: বৎস, আমি তোমায় তো একটা কাঠের কৌটো দিয়ে গেছিলাম, আর তাতে ছিল পাঁচ শোটা ধান। এগুলো তুমি কোথায় পেলে?

রূপক বলল: এ সবই আপনার দেওয়া ধান থেকে হয়েছে। কাঠের কৌটোর মধ্যে যে ধান ছিল, তা দিয়ে আমি চাষবাস শুরু করি। তিন বছর ধরে চাষ করে যে ধান পাই, তা' বেচে আমি সেই অর্থ নিয়ে বিদেশে চলে যাই। বিদেশে গিয়ে এক হাজার গাঁট তুলো কিনি। সেই তুলো এক ব্যবসায়ীকে বিক্রি করে তার কাছ থেকে দশটি ঘোড়া পাই। ঐ দশটি ঘোড়া এক সরাইখানার

মালিককে বিক্রি করে তার বিনিময়ে পাই দু'শ মোহর। ঐ দু'শ মোহর দিয়ে কিছু লাল প্রবাল কিনি এবং এক প্রধান ব্যবসায়ীর কাছে তা বিক্রি করে আরো পঞ্চাশটি মোহর লাভ করি। ঐ প্রবাল-ব্যবসায়ীর মুখেই শুনি যে পূর্বদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। আমি তখন ঐ সরাইখানার মালিকের কাছে আবার ফিরে যাই এবং তার কাছ থেকে দুটো ঘোড়া ভাড়া নেই। তারপর সেখান থেকে সস্তায় চাল-ডাল-গম কিনে পূর্বদেশে সরবরাহ করতে শুরু করে দিই। ফলে আমার মোট সাড়ে পাঁচশো মোহর লাভ হয়। পাঁচ শো মোহর তখন আমি সযত্নে তুলে রাখি এবং একজন সুদক্ষ স্বর্ণকারকে দিয়ে আপনার দেওয়া কাঠের কৌটোর মত অবিকল ঐ সোনার কৌটোটা তৈরী করি। আপনি পত্রে লিখেছিলেন, সাত বছর পর ফিরে এসে হিসাব নেবেন। তাই আর বিদেশে থাকা সমীচীন নয় মনে করে আজ আমি সেই হিসাব দিতে এসেছি। ঐ কৌটোর মধ্যেই আপনার দেওয়া ধানের সেই হিসাব রয়েছে। আর এই নিন আপনার দেওয়া কাঠের কৌটো।

এই বলে সে পিতার হাতে সাত বছর আগে বিদেশভ্রমণে যাওয়ার সময় বিদ্যারণের দেওয়া কাঠের কৌটোটা তুলে দিল।

বিদ্যারণ্য এতক্ষণ মন দিয়ে রূপকের কথা শুনছিলেন, এবার সানন্দে রূপককে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন: তুমিই আমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। তোমার মত বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ীর হাতে আমার বিষয়-সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্যের ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব।

এই বলে তিনি উপস্থিত সকলের সামনে দান-পত্র রচনা করে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ভার রূপকের হাতে অর্পণ করলেন। তারপর তাকে আন্তরিক আশীর্বাদ জানিয়ে পাশে নিয়ে বসলেন।

ভোজ-সভা যথারীতি শুরু হল।

বিজ্ঞানী মাদাম কুরী

রাজলক্ষ্মী দাশগুপ্ত

বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতিতে আজ আমরা গর্বিত, আনন্দিত। বিজ্ঞানের দান অপরিমেয়। বিজ্ঞান মানুষের জীবনকে করেছে সমৃদ্ধ, স্বচ্ছন্দ, সুন্দর। বিজ্ঞানের বলে অদৃশ্য গ্রহান্তর-যাত্রার চেষ্টা সফল হতে চলেছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো সৃষ্টির সকল রহস্য অনাবৃত হবে, নতুন পৃথিবী সৃষ্টির গৌরব অর্জন করবে বিজ্ঞানীরা।

বিজ্ঞানের অক্লান্ত সাধনা চলেছে দেশে দেশে। নিত্য-নতুন আবিষ্কারে পৃথিবীর সভ্যতার

উন্নতি হচ্ছে ধাপে ধাপে। বিজ্ঞান-চর্চার দ্বার আজ সকলের কাছে উন্মুক্ত। মেয়েরাও বিজ্ঞানের জয়-যাত্রায় যোগদান করেছেন। শতাব্দীর জীবনের সঙ্গে জড়িত রয়েছে আধুনিক বিজ্ঞান। আজ আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি, বিজ্ঞানের যুগে বাস করছি আমরা।

কিন্তু বিজ্ঞানের অভাবনীয় সাফল্যের মূলে যে একটি মহিলা-বিজ্ঞানীর অসামান্য অবদান রয়েছে তা' হয়তো অনেকেরই জানা নেই। এই চিরস্মরণীয়া বিজ্ঞানী নিজের বিজ্ঞান-সাধনাকে বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। পারমাণবিক যুগ সৃষ্টির সহায়তা করেছে তাঁর আবিষ্কার—রেডিয়াম ও তেজস্ক্রিয়তা। এই আবিষ্কার বিজ্ঞান-চর্চার নব-দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

এই অনন্য প্রতিভাময়ীর নাম মাদাম কুরী।

বিজ্ঞান-চর্চায় তাঁর অমূল্য অবদানের জন্যই তিনি দুবার 'নোবেল পুরস্কার' লাভের দুর্লভ সম্মান লাভ করেছিলেন। তিনি শুধু বিজ্ঞান-চর্চার আদর্শ স্থাপন করে যাননি, উত্তরসাধকের সাধনার পথ-নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কর্মনিষ্ঠা, চরিত্রবলে একাগ্র অনুশীলনই সাফল্যের সোপান। মাদাম কুরীর জীবন থেকে আমরা এ শিক্ষাই পেয়ে থাকি। তিনি ছিলেন একাধারে জননী, গৃহিণী ও বিজ্ঞান-সাধনায় আত্ম-নিয়োজিতা তপস্বিনী। পারিবারিক দায়িত্ব পালনের পর অপরিসীম ধৈর্য ও অদম্য উৎসাহে তিনি করেছেন অক্লান্ত বিজ্ঞান-সাধনা। বাধা-বিপদ এসেছে; কিন্তু অধ্যবসায়, সাহস ও গভীর আত্মবিশ্বাসের বলে তিনি হয়েছেন জয়ী। বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন এই মনস্বিনী।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না মাদাম কুরী আজ থেকে একশো বছর আগে—১৮৬৭ সালের ৭ই নবেম্বর তারিখে জার্মানীর ওয়ারস প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন পোল্যাণ্ডের একজন অধ্যাপক। শৈশবে মাতৃহারা মেয়েটি বাবার আদরে পালিতা হন। বাবাকে তিনি ভালবাসতেন স্বাভাবিকভাবেই। বাবার পরেই তাঁর সর্বাধিক প্রিয় ছিল জন্মভূমি। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে তিনি বুঝলেন, তাঁর মাতৃভূমি রুশদের নিপীড়নে জর্জর। তাই রুশদের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ ছিল আশৈশব। দেশ ও দেশবাসী ছিল তাঁর পরম প্রিয়।

এই দেশপ্রেমই তাঁকে দেশছাড়া করেছিল। হয়তো তারই ফলে পৃথিবী তাঁর কাছ থেকে উপহার পেয়েছিল মহামূল্য আবিষ্কার। পৃথিবীতে যাঁরা বড় হন, এমনি অতর্কিতে তাঁদের জীবনের মোড় ঘুরে যায়। বিপ্লবাত্মক কার্যে লিপ্ত থাকলে আমরা হয়তো বিজ্ঞানী মাদাম কুরীকে পেতাম না।

শৈশব থেকে মাদাম কুরী স্বপ্ন দেখতেন—তিনি হবেন বিজ্ঞানী. বিজ্ঞান-চর্চাকেই তাঁর জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করবেন। সেদিন থেকে মেয়ের এই আকাঙ্ক্ষাকে সবাই অবান্তর কল্পনা ছাড়া আর কিছু মনে করতো না। মেয়ে হয়ে বিজ্ঞানচর্চা করা কি সম্ভব? কিন্তু মাদাম কুরী তাঁর সংকল্পে অটল। তাই সফল হয়েছিল তাঁর স্বপ্ন ও সাধনা। দুর্লভ গৌরবের অধিকারিণী হয়েছিলেন তিনি।

জন্ম থেকেই মাদাম কুরী ছিলেন নির্ভীক। সতেরো বছর বয়সে তিনি বিপ্লবীদের দলে যোগ দেন। বিপ্লবের সাহায্যে রুশদের বিতাড়িত করার গোপন প্রচেষ্টা চালাতে থাকে তরুণ দেশ-প্রেমিকেরা। মাদাম কুরী হলেন তাঁদের সাথী। তাঁর অন্তরে প্রবল দেশানুরাগ। বিপ্লবীদের ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হলো। মাদাম কুরী দেশ ছেড়ে ফরাসী দেশে পালাতে বাধ্য হলেন। এবার শুরু হলো তাঁর নতুন জীবন।

প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করে তিনি সর্বনের রসায়নাগারে শিক্ষানবিশী আরম্ভ করলেন। তিনটি বছর কেটে গেল দেখতে দেখতে। তিনি যেন তাঁর বিজ্ঞান-চর্চার আকাঙ্ক্ষা পূরণের শুভলগ্নের প্রতীক্ষায় রইলেন। অবশেষে এলো প্রত্যাশিত ক্ষণ। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলো তরুণ গবেষক পিয়ের কুরীর। সর্বন থেকে গ্রাজুয়েট হয়ে বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা করছিলেন পিয়ের কুরী। সৌম্যদর্শন তরুণকে পছন্দ করলেন মাদাম কুরী। পিয়েরও এই মেয়েটির প্রখর বুদ্ধিমত্তা, প্রতিভা ও বিদ্যানুরাগে বিমুগ্ধ হলেন। দুজনে দুজনকে ভালোবাসলেন। পরস্পরের নিবিড় সান্নিধ্যলাভের জন্য ব্যাকুল হলেন দুটি তরুণ-তরুণী। শুভদিনে দুজনের শুভ-পরিণয় সম্পন্ন হলো।

এবার মাদাম কুরীর জীবনে এলো তাঁর আকাঙ্ক্ষিত সুযোগ। বিজ্ঞান-সাধনার দ্বার হলো উন্মুক্ত। স্বামীর আগ্রহে ও সাহায্যে কুরীর পড়াশুনা এগিয়ে চললো, আর পিয়ের কুরী পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপকের কাজ নিয়ে গবেষণা চালাতে লাগলেন।

দুর্লভ প্রতিভাময়ী মাদাম কুরী শুধু পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারলেন না। স্বামীর গবেষণায় সহকর্মিনী হলেন তিনি। সহধর্মিনী হলেন সহকর্মিনী—সত্যিকারের গৃহিণী। স্বামীর কাজে তাঁর সাহায্য হলো অপরিহার্য।

১৮৯৭ সালে তাঁর মেয়ে আইরিণের জন্ম হলো। মা হলেন মেরী। তাঁর স্বামীর গবেষণা তখনো সম্পূর্ণ হয়নি। সুতরাং তিনি তাঁর শিশু-কন্যাকে কোলে করে ঘরের কোণে বসে থাকতে পারলেন না। আঁতুড়-ঘর থেকে বেরিয়ে এক সপ্তাহ পরেই ফিরে এলেন স্বামীর গবেষণাগারে। নবজাতক রইলো পিয়েরের বৃদ্ধ পিতার কাছে। দাদুর কাছে পালিতা হতে লাগলো আইরিণ।

দু বছর ধরে চললো স্বামী-স্ত্রীর যুগ্ম বৈজ্ঞানিক গবেষণা। ফলে আবিষ্কৃত হলো নতুন ধাতু রেডিয়াম। কিন্তু এই আবিষ্কারের কথা তাঁরা কাউকে জানালেন না। পিয়ের তাঁর অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত রইলেন, মেয়েদের স্কুলে পদার্থবিদ্যার শিক্ষয়িত্রী হলেন মাদাম কুরী। তাঁর মেয়ে আইরিণকে এনে রাখলেন তাঁর কাছে। মেয়ের দেখা-শোনার ভার নিলেন নিজের হাতে। স্বামীর কর্তব্যপালনে এতটুকু শৈথিল্য ছিল না তাঁর। কিন্তু তিনি বিজ্ঞানী, আবিষ্কারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর অন্তরে। তাঁদের নবাবিষ্কৃত উপাদান সম্বন্ধে গবেষণা চালাতে লাগলেন গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে।

পাঁচটি বছর কেটে গেল। এরই মধ্যে পলোনিয়াম, রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম ও অন্যান্য

উপাদানের কার্যকারিতা সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করলেন তিনি। প্রবন্ধটি পরীক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করলেন। পরীক্ষকমণ্ডলী মুগ্ধ বিস্মিত হলেন প্রবন্ধ-রচয়িত্রীর অভিনব গবেষণায় ও পাণ্ডিত্যে। পরীক্ষকেরা একবাক্যে স্বীকার করলেন—বিজ্ঞানের ইতিহাসে এমন অসাধারণ প্রবন্ধ আর কখনও রচিত হয়নি। সাড়া পড়ে গেল সমগ্র বিশ্বে। পৃথিবীর অধিবাসীরা জানলো—একটি নতুন ধাতু আবিষ্কৃত হয়েছে—যার নাম রেডিয়াম। এর ধাতব লবণ অন্ধকারকে আলোকিত করে, এ ধাতু অবিশ্রান্ত কয়লার তাপের চাইতে পাঁচ লক্ষগুণ বেশি তাপ উদ্গিরণ করছে। এ ধাতুর ব্যবহারে ক্যানসার নিরাময় হয়, জীবাণু বিনষ্ট হয়, রঙীন হীরক বিবর্ণ হয়। কঠিন বস্তুর মধ্যে প্রবেশের শক্তি নিহিত রয়েছে এই ধাতুর মধ্যে।

অবিলম্বে বিশ্বজোড়া খ্যাতির অধিকারী হলেন কুরী-দম্পতি। বিভিন্ন দেশ থেকে অভিনন্দন আসতে লাগলো তাঁদের কাছে। বিজ্ঞান-সাধনার তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হলো মাদাম কুরী ও পিয়ের কুরীর বাসভূমি। তাঁদের সম্বন্ধে নানা উপাখ্যান প্রচলিত হলো মুখে মুখে। তাঁরা যেন রূপকথার নায়ক-নায়িকা।

খ্যাতির গর্বে এতটুকু গর্বিত হলেন না মাদাম কুরী। নির্বিকার-চিত্ত তিনি। ছোট্ট মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে আপন সংসারের কাজে মত্ত হয়ে রইলেন।

অভিনন্দন, উপহার ও আমন্ত্রণ আসতে লাগলো অনবরত। দেশবাসী তাঁদের সম্মানে ভূষিত করতে চাইলেন। কুরী-দম্পতি বললেন, একটি আধুনিক গবেষণাগার নির্মাণ করে দেওয়াই হবে তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান।

কয়েক মাস পরেই বিজ্ঞান-চর্চায় তাঁদের অসামান্য কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসাবে তাঁরা পেলেন সুবিখ্যাত 'নোবেল পুরস্কার'। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত হলেন তরুণ বৈজ্ঞানিক দম্পতি।

কিন্তু সুদীর্ঘ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তা তাঁদের ছিল না। তাই অনেক টাকা ধার করতে হয়েছিল। নোবেল পুরস্কারের টাকাগুলি ধার শোধ করতেই নিঃশেষ হয়ে গেল। অভাব-অনটন ঘুচলো না।

এই অমূল্য আবিষ্কার 'পেটেন্ট' করার পরামর্শ দিল অনেকে। বললো, তাতে প্রভূত অর্থাগম হবে। কিন্তু এ প্রস্তাবে রাজী হলেন না তাঁরা।

পাহাড়ের গা থেকে যে রেডিয়াম-লবণ তাঁরা সংগ্রহ করতেন, তা তাঁরা হাসপাতালে বিনামূল্যে বিতরণ করতে লাগলেন।

আইরিণের বয়স যখন সাত তখন আর একটি নতুন অতিথি এলো তাঁদের ঘরে। তার নাম রাখা হলো 'ঈভ ভেনিসি'। ইতিমধ্যে তাঁদের অর্থাভাব ঘুচেছে। সুখের মাত্রা পূর্ণ হয়েছে। বৈজ্ঞানিকের সাধনা জয়যুক্ত হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যশের মালা পরেছেন গলায়। এমন সৌভাগ্য হয় ক'জনের ?

এবার তাঁরা নিশ্চিন্ত। অনাবিল আনন্দে কেটে যাবে ভবিষ্যতের দিনগুলি। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হলো না সুখ। ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে পথ-দুর্ঘটনায় অকালে প্রাণ হারালেন পিয়ের কুরী। শোকের নির্মম শেল বিঁধলো মাদাম কুরীর বুকে। স্বামিহারা মাদাম স্তব্ধ হলেন, নীরবে কাঁদলেন। যেন নাবিকহীন হলো সংসার-তরণী। সকলেই ভাবলো, এই মহীয়সী মহিলার প্রতিভাও বুঝি স্তব্ধ হয়ে গেল এখানে, পৃথিবী হয়তো বঞ্চিত হলো অনেক দুর্লভ সম্ভাবনা থেকে।

কিন্তু বিজ্ঞান-সাধনা যাঁর জীবনের স্বপ্ন ও সংকল্প, তাকে হতে হবে অচঞ্চল, মহীরুহের মতো দৃঢ়, দুঃখে-শোকে স্থির, অবিচল। তপস্যার পথ, সাধনার পথ বন্ধুর। দুঃখ-বাধা-বিপদ অতিক্রম করে লক্ষ্যপথের দিকে চলতে হবে, তবেই তো আসবে সিদ্ধি।

স্বামী-শোকে উন্মাদিনী হয়ে পড়লেন মাদাম কুরী। শোকের বেগ কাটিয়ে উঠলেন অচিরে। সাধ্বী পত্নী মৃদু পদসঞ্চারে প্রবেশ করলেন স্বামীর গবেষণাগারে। সংকল্প গ্রহণ করলেন—জীবনের বাকি সময়টুকু কাটিয়ে দেবেন স্বামীর স্মৃতির ধ্যানে।

ফরাসী দেশ তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি হিসাবে তাঁকে তাঁর স্বামীর আসনে বসালো। পদার্থ-বিদ্যার প্রধান অধ্যাপকের পদ দেওয়া হলো তাঁকে সর্বনে। সে এক অভিনব ব্যাপার। এর আগে এই সম্মানিত পদ অলঙ্কৃত করেনি কোন মহিলা। বয়োজ্যেষ্ঠেরা ক্ষুণ্ণ হলেন, নারীর প্রতিভা সম্বন্ধে সন্দিহান ব্যক্তিরা নাসিকা কুঞ্চিত করলেন। অবিলম্বেই সত্য আবিষ্কৃত হবে, দেখা যাবে তিনি সত্যিকারের প্রতিভাময়ী কিনা।

এলো সর্বনের ঐতিহাসিক মঞ্চে তাঁর আবির্ভূতা হবার দিন। কক্ষে সমবেত হলেন রাজনীতিবিদ, বৈজ্ঞানিক, ফরাসী দেশের রাষ্ট্রপতি, পর্তুগালের রাজা-রাণী, সকলেই উৎসুকচিত্তে অপেক্ষমান।

পাশের দরজা খুলে প্রবেশ করলেন কালো পোশাকপরা একটি মহিলা। সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হলো আনন্দোচ্ছ্বাস। সকলে তাঁকে জানালো সশ্রদ্ধ অভিনন্দন। ধীর পদক্ষেপে মঞ্চের উপর উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তাঁর মুখে স্বামী-শোকের ছায়া সুস্পষ্ট। জনতার উদ্দেশ্যে কম্পিত হাতখানি তুললেন, তারপর শুরু করলেন বক্তৃতা। সুস্পষ্ট, সুশ্রাব্য মধুস্রাবীকণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন। যেন যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ হলো সকলে। পোলিনিয়াম সম্বন্ধে তার স্বামী যেখানে থেমেছিলেন ঠিক সেখান থেকেই আরম্ভ করলেন তিনি। স্বামীর শেষ বক্তৃতা থেকে শুরু হলো পত্নীর প্রথম বক্তৃতা।

তবু সংশয় ঘুচলো না অনেকের। তারা ভাবলো, স্বামীর উপর নির্ভরশীল তাঁর প্রতিভা, সত্যিকারের প্রতিভাময়ী নন তিনি। কিন্তু তাতে তাঁর যায়-আসে না কিছু। বিজয়িনী হয়েছেন তিনি। এবার নতুন কাজে ব্রতী হলেন কুরী। রেডিয়ামকে সম্পূর্ণ আলাদা করতে হবে, বিচ্ছিন্ন করতে হবে অন্যান্য উপাদান থেকে। অক্লান্ত সাধনা চললো। ১৯১০ সালে তিনি করলেন স্মরণীয়

আবিষ্কার। আলাদাভাবে তৈরি করলেন রেডিয়াম—সাদা বটিকা যা বাতাসে নিষ্প্রভ হয়। স্বামীর সাহায্য ছাড়া তিনি করলেন এই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার। এতদিন যারা তাঁর যোগ্য মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত ছিল এবার নীরব হলো তাদের কণ্ঠ। নোবেল কমিটি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য তাকে দ্বিতীয়বার নোবেল পুরস্কার দিলেন। বিশ্বের বৈজ্ঞানিক মহলে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত হলেন তিনি।

মুহূর্তের জন্যও বিজ্ঞান-চর্চায় ক্ষান্ত হলেন না মাদাম কুরী। তাঁর গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চলতে লাগলো।

আরম্ভ হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। গবেষণাগার থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। পাঁচশো মেয়েকে রেডিওলজিক্যাল অপারেটারের কাজ শেখাতে লাগলেন। তাঁর মেয়ে আইরিণকেও নিলেন দলে। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে রেডিয়াম ইনস্টিটিউট স্থাপিত হলে তিনি হলেন তার ডাইরেক্টার। রেডিয়াম নিষ্কাশনের কাজে কাটিয়ে দিলেন যুদ্ধের বাকি সময়টুকু।

মহাযুদ্ধের শেষে কুরীর প্রিয় মাতৃভূমি স্বাধীন হলো। তাই তাঁর আনন্দ হলো সীমাহীন।

১৯২১ সালের মতো ১৯২৯ সালে আমেরিকায় ডাক পড়লো তাঁর। তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে তখন। তবু তাঁর মাতৃভূমির সম্মানার্থে আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করলেন না তিনি।

তিনি নবাবিষ্কৃত মহাশক্তি-সম্পন্ন লবণ নিয়ে গবেষণা করলেন আরও চার বছর।

মানব-কল্যাণব্রতে দীক্ষিতা এই মহিলা বিজ্ঞানী ১৯৩৪ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে দেহত্যাগ করলেন। বিশ্বের বিজ্ঞান-জগতের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক চিরদিনের জন্য নির্বাপিত হলো। এক অনন্যসাধারণ তপস্বিনী তাঁর সমগ্র জীবনের তপস্যার ফল বিশ্বের কল্যাণের জন্য সমর্পণ করে ধরাধাম থেকে বিদায় নিলেন।

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কুরী লেবরেটারী' মাদাম কুরীর স্মৃতিসৌধরূপে সগৌরবে বিরাজমান। তাঁর সুযোগ্যা কন্যা আইরিণ ও তাঁর স্বামী জিন ফ্রেডারিক জোলিয়েত ১৯৩৫ সালে আবিষ্কার করলেন—সাধারণ উপাদানের মধ্যে রঞ্জনরশ্মির কার্যকারিতা। বিশ্ববরেণ্যা কুরীর উত্তরসাধক রূপে তাঁরাও বিশ্বের বৈজ্ঞানিক-সমাজে যোগ্য স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

মাদাম কুরীর আবিষ্কার রোগজর্জর মানবের বেদনার লাঘব করেছে, তেজস্ক্রিয়তার গরল-পাত্র থেকে তিনি অমৃতটুকু আহরণ করেছিলেন অক্লান্ত সাধনায়। নিজের আর্থিক অসচ্ছলতা ও দৈহিক পীড়া উপেক্ষা করে মানবের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কর্মনিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন মাদাম কুরী।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাসে মাদাম কুরীর নাম অমর অক্ষরে লেখা রয়েছে। তাঁর জন্ম-শতবর্ষ পূরণের দিনে বিশ্ববাসী তাঁকে জানিয়েছে সশ্রদ্ধ প্রণাম।

আর্থারের তলোয়ার

চিত্ত ঘোষাল

যীশুখ্রীষ্ট-জন্মের চারশো বছর পরের কথা।

তখনকার দিনে সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ ছিল রোম। আর রোমের রাজত্বও ছিল বিশাল। বলতে গেলে, রোমের রাজত্বে তখন সূর্য অস্তই যেত না। যে ইংরেজরা আড়াইশো বছর ধরে আমাদের দেশ শাসন করেছিল, তাদের দেশ হোল ব্রিটেন। সেই ব্রিটেনও তখন ছিল রোমের অধীনে, অর্থাৎ রোম যা বলতো, ব্রিটেন তাই শুনতো, যেমন আমরা উঠতে বসতে শুনতাম ব্রিটেনের কথা।

ব্রিটেন শাসন করতে এসে রোমীয়রা দেখলো, দেশটার মধ্যে সব কিছু আছে, অথচ কিছুই নেই। দেখবারই কথা। কেননা, সভ্যতার দিক থেকে রোমই ছিল তখন একমাত্র সভ্য দেশ। তাই গোড়া থেকেই তারা চেষ্টা শুরু করলো ব্রিটেনকে নিজের মনোমত গড়ে তুলতে। ফলে, ব্রিটেনের মানুষগুলোর রোমের লোকগুলোকে এত ভালো লেগে গেল যে তারা পরস্পরে বন্ধু হয়ে উঠলো।

সে সময়ে স্কট্‌ল্যাণ্ডের মানুষগুলোর কাজ ছিল খালি ডাকাতি আর লুট-পাট। ওরা এক একজন রীতিমত জলদস্যু। সময় নেই, অসময় নেই, ওরা দলে দলে ওদের ড্রাগন-মুখ বজরা নিয়ে সমুদ্রে বেড়িয়ে বেড়াতো আর সামনে যা পেতো, তাই লুটে-পুটে নিয়ে যেতো। এদের বলা হোত পিক্‌ট্‌স্‌। দস্যুগিরির ব্যাপারে এদের মধ্যে কোন স্নেহ-মায়া-দয়া থাকতো না। প্রয়োজন পড়লে এরা এদের তরবারি দিয়ে হাসতে হাসতে ধড় থেকে মাথাটা নামিয়ে দিতো, নয় তো এক খোঁচায় পেট থেকে নাড়ি-ভুঁড়িগুলো বের করে দিতে পারতো।

রোম দেখলো, এই পিক্‌ট্‌স্‌রা ব্রিটেনের উপকূলে এসে হামেশাই হানা দিচ্ছে। আর পালে পালে গরু-ভেড়া, ঘোড়া ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ওদের ভয়ে ব্রিটেন শঙ্কিত। ব্রিটেনকে সেই অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে রোম করলে কি—সোজা পুব থেকে পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত একটা বিরাট পাথরের পাঁচিল তুলে দিলে। সেই পাঁচিলটা ছিল লম্বায় তিয়াত্তর মাইল। প্রতি চার মাইল অন্তর একটা করে বড় কেল্লা। দুটো করে কেল্লার মাঝখানে তিনটে করে পরিখা। আর পরিখার মাঝখানে ছোট ছোট দুটো করে বুরুজ। এই বুরুজের উপরে সজাগ সান্ত্রীরা সব সময় পাহারা দিতো। দূর থেকে পিক্‌ট্‌স্‌দের আসতে দেখলেই এরা সংকেত দিতো আর কেল্লা থেকে হুড়হুড় করে সৈন্যরা বেরিয়ে দস্যুদের তাড়া করতো। এই পাঁচিলের নাম ছিল হাদ্রিয়াঁর পাঁচিল। হাদ্রিয়াঁ ছিলেন রোমের একজন সম্রাট।

ব্রিটেনের গরু-ঘোড়ায় আর মন ভরছিল না পিক্‌ট্‌স্‌দের। ওদের এবার নজর পড়লো রোমের দিকে। রোমে অনেক পয়সা। সুতরাং ওখানে গিয়ে বসবাস করতে পারলে, ওদের আর কোন দুঃখই থাকবে না। ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ শুরু হয়ে গেল। ইতালির ভিতর দিয়ে ওরা সদলবলে এগিয়ে চললো রোমের দিকে। এবার প্রবাসী রোমবাসীদের এলো দেশের ডাক। যেখানে যত রোম-সৈন্য ছিল এবার সকলেই ফিরে চললো দেশের দিকে। যেমন করেই হোক, ঐ দস্যুদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতেই হবে। হাদ্রিয়াঁর প্রাচীর-কেল্লা খালি হয়ে গেল। ব্রিটেন শাসনের ভার দেশের মানুষদের হাতে দিয়ে ব্রিটেন ছেড়ে চলে গেল রোমীয়রা। যাবার সময় বলে গেল—আমরা আমাদের ঘর সামলাতে চললাম। তোমরা তোমাদের ঘর সামলাও। অ্যাংলো-স্যাক্সনদের কিন্তু খুব সাবধান।

ব্রিটেন খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়লো। হবারই কথা। যদিও এতদিন পরাধীন ছিল, তবু আপদে বিপদে রোম ছিল সহায়। এখন যদিও স্বাধীন হোল, দেখলো চতুর্দিকে শত্রু। কোথায় স্বাধীনতার জন্য আনন্দ করবে, তা না করে খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়লো।

ইউরোপের উত্তরদিকে থাকতো এই অ্যাংলো-স্যাক্সনরা। ছোট কথায়, এদের বলা হয় ইংলিশ। তখন এদেরও পেশা ছিল দস্যুগিরি, ডাকাতি, লুঠ-পাট। প্রায়ই ব্রিটেনে এসে এরা হামলা করতো, মাথায় পালকের টুপি, গায়ে লাল রঙের কোট, কোটের উপর আঁকা থাকতো অসংখ্য চাকা। হাতে লোহার বাঁট দেওয়া কাঠের ঢাল, তীরের মত ছোট ছোট বল্লম, আর কুড়ুল, হঠাৎ হুড়মুড় করে এসে পড়তো ব্রিটেনের উপর। পালাবার সময়টুকুও দিতো না, তবু ঘর-বাড়ী, দোকান-পাট ফেলে যে যেখানে পারতো পালাতো। ওরা সামনে যা পেতো লুটে-পুটে নিতো, এমন কি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরও ধরে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রী করে দিতো। এতদিন রোমই ওদের ঠেকিয়ে রেখেছিল। এখন রোম যেই চলে গেল অমনি স্যাক্সনরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো ব্রিটেনের উপর। ব্রিটেনও রুখে দাঁড়ালো। দুদলে ভীষণ যুদ্ধ। অ্যাংলো-স্যাক্সনরা প্রায় হটে যাচ্ছে, হঠাৎ দেখলো হাদ্রিয়াঁর প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসছে পিক্‌ট্‌স্‌রা। এবারে চোখে অন্ধকার দেখলো ব্রিটেনের সৈন্যেরা। কোন্ দিক সামলাবে! সবাই মিলে এবার ছুটলো পিক্‌ট্‌স্‌দের রুখতে। পিক্‌ট্‌স্‌দের হটিয়ে দিয়ে দেখলো অ্যাংলো-স্যাক্সনরা অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। লড়াই দিতে কসুর করলো না ব্রিটেন। প্রায় দুশো বছর ধরে অ্যাংলো-স্যাক্সনদের সঙ্গে লড়াই করেছিল ব্রিটেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের দেশের স্বাধীনতা তারা বজায় রাখতে পারলো না। অনেক সৈন্য গেল, সেনাপতি গেল তবু ব্রিটেন দখল করে নিল অ্যাংলো-স্যাক্সনরা। আর এই যুদ্ধেই প্রাণ দিয়েছিলেন ব্রিটেনের একজন বীর—আর্থার।

সে সময়ে পরীক্ষা দিয়ে যে নিজেকে সেরা বলবান প্রতিপন্ন করতে পারতো, সে-ই হোত দেশের প্রধান, অর্থাৎ সারা দেশ তার কথা শুনবে এবং তার আদেশমত কাজ করবে। আর্থার তখন

যুবক, তবুও পরীক্ষায় তিনি প্রথম হলেন এবং সকলেই তাঁকে রাজা বলে স্বীকার করে নিলো। দস্যুদের সঙ্গে বারোটা বড় বড় যুদ্ধ লড়েছিলেন এই বীর। আর্থারের বীরত্ব একটা রোমাঞ্চকর কাহিনী। আমাদের দেশে যেমন বীর জরাসন্ধ, ভীম, কংস প্রভৃতির সম্বন্ধে নানা অলৌকিক গল্প আছে, ওদেশেও তেমনি বীর আর্থার সম্বন্ধে এক মজার গল্প আছে।

সামনা-সামনি বীরবিক্রমে এক দস্যুর সঙ্গে লড়ছিলেন আর্থার। দু'জনের দেহই লোহার বর্মে ঢাকা। হাতে ঝকঝকে ঢাল। লড়াই-এর ফলে দু'জনের লড়ুয়ে ঘোড়া দু'দিকে ছিটকে যাচ্ছে। ঢালে লেগে আর্থারের বর্শা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। দস্যুর কুড়ুল ভাঙ্গলো। দু'জনেই নেমে পড়লেন ঘোড়ার পিঠ থেকে। তরবারি খুলে দু'জনেই দু'জনকে ভীমবেগে আক্রমণ করলেন। একবার আর্থার পিছু হটেন তো দস্যু এগোয়, আর একবার আর্থার তেড়ে যান তো দস্যু পিছু হটে। প্রাণপণ সে এক ভীষণ লড়াই। কয়েক ঘন্টা ধরে লড়াই করার পর প্রায় যখন দস্যুকে কাবু করে এনেছেন, এমন সময় হঠাৎ আর্থারের তরবারি ভেঙ্গে দু'খানা হয়ে গেল। কোন রকমে পালিয়ে বাঁচলেন আর্থার।

মনে ভীষণ দুঃখ। আর তো কোন তরবারি নেই আর্থারের। কি দিয়ে তিনি লড়বেন! আহা, যদি তাঁর আর একটা তরবারি থাকতো। বেঁচে থেকেও তিনি কিছুই করতে পারবেন না আর, তাঁর চোখের সামনে দিয়ে দস্যুরা সব লুটে পুটে তাঁর দেশের সর্বনাশ করে দিয়ে যাবে। এমন হতাশা নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে যুদ্ধ করতে করতে মরে গেলেও বুঝি এত দুঃখ হোত না।

—কি হয়েছে? অমন বিমর্ষ কেন আর্থার?—জিজ্ঞেস করলেন মারলিন।

মারলিন সবই জানতেন, তবু জিজ্ঞেস করলেন। তখনকার দিনে মারলিনের তুল্য জ্ঞানী সারা ব্রিটেনে আর দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। তিনি চোখ বুজে সুদূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পেতেন। বৃদ্ধ মারলিন। লোকে বলে তখনই তাঁর বয়স হয়েছিল দু'শো বছর, তবুও তিনি ছিলেন বেশ শক্ত। আর্থারকে যেমন মারলিন যথেষ্ট স্নেহ করতেন, মারলিনকেও তেমনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন আর্থার। আর্থারের মুখ থেকে সব শুনলেন মারলিন।

—বেঁচে থেকেও আমি আমার দেশের মানুষদের কোন কাজে আসবো না!

আর্থারের গলা যেন কান্নায় বুজে আসছিল।

—কে বললে, তুমি কাজে আসবে না আর্থার? তুমিই তো দেশকে রক্ষা করবে।

—কিন্তু কেমন করে? আমার তলোয়ার……

—তার জন্যে দুঃখ কি আর্থার? আমার সঙ্গে চল। আমি তোমাকে এখনই আরও মজবুত তলোয়ার দেবো।

খুশীতে ভরে উঠলো আর্থারের মন। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলেন তিনি।

—কই দেরী করছো কেন মারলিন? চলো।

আর একটুও সবুর সইতে রাজী ছিলেন না তিনি।

ঘোড়ার পিঠে আর্থার আর পাশে পাশে পায়ে হেঁটে চলেছেন জ্ঞানবৃদ্ধ মারলিন। সূর্য অনেকক্ষণ অস্ত গিয়েছিল, তবুও বনের সরু পথটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। ধবধবে সাদা চাঁদটা ঝকঝক করছিল আকাশে। তাই কোথাও এতটুকু অন্ধকারের আড়ালও ছিল না।

চলতে চলতে একসময় বন শেষ হয়ে গেল। ওঁরা এসে দাঁড়ালেন এক নির্জন হ্রদের কূলে। চাঁদের আলোয় পাতলা রূপোর পাতের মত চক্‌চক্ করছে হ্রদের জল।

জলের দিকে চেয়েই আর্থার স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁর সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে আর একবার ভালো করে তাকালেন। ভুল দেখছেন না তো? কিংবা কোন স্বপ্ন? না, তিনি ঠিকই দেখছেন—হ্রদের ঠিক মাঝখানটিতে জলের উপর হাত তুলে কে যেন ধরে রয়েছে একটা তলোয়ার।

—ঐ তোমার তলোয়ার।

অবাক দৃষ্টিতে আর্থার তাকিয়ে রইলেন মারলিনের দিকে। কোন ভোজবাজী নয় তো?

—কি দেখছো? নাওগে। হ্রদের দেবী তোমায় দিচ্ছেন।

আর্থার আবার তাকালেন হ্রদের দিকে। তখনও সেই হাত উপরে উঠে রয়েছে, ধরে রয়েছে সেই তলোয়ার। আর্থার আরো দেখলেন—হ্রদের অপর পাড়ে জলের কোল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছেন এক অপরূপ সুন্দরী নারীমূর্তি। অল্পক্ষণ আগেও সে মূর্তি ওখানে ছিল না। আর এপাড়ে নদীর কিনারে মাঝিহীন একটা ছোট নৌকো।

—ঐ নৌকোতে ওঠো।—বললেন নারীমূর্তি।—এই তলোয়ার তোমারই। আমি তোমায় দিচ্ছি। নাও। এর নাম এক্সক্যালিবার।

কোন কথা বলার শক্তি ছিল না আর্থারের। বিস্ময়ের উপর আরও বিস্ময়,—নৌকোতে উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গেই নৌকো আপনি চলতে শুরু করলো, দাঁড় টানতে হোল না আর্থারকে।

—পরিবর্তে আমি কিন্তু একটা জিনিস চাইবো আর্থার!

—আপনার জন্য আমায় কি করতে হবে বলুন,—মন্ত্রমুগ্ধের মতো জিজ্ঞেস করলেন আর্থার।

—সময় হলেই বলবো।—বললেন নারীমূর্তি।

এক্সক্যালিবার তলোয়ারের হাতল ধরলেন আর্থার। জলের বুকে ছোট্ট ঢেউ তুলে সেই হাতটা ডুবে গেল। দেহে মনে এক প্রবল উত্তেজনা অনুভব করতে শুরু করলেন আর্থার—যেন দ্বিগুণ শক্তি জেগে উঠেছে তাঁর দেহের পেশীতে। একটু পরে আর্থার চেয়ে দেখলেন সেই নারীমূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেছে।

অজেয় সেই তলোয়ার নিয়েই তার পর থেকে আর্থার যত লড়াই করেছিলেন—সব কয়টাতেই তিনি দস্যুদের হারিয়ে দিয়েছিলেন এবং তিনি যতদিন সেই তলোয়ার হাতে বেঁচে ছিলেন, ততদিন ব্রিটেনের মানুষ ছিল নিরাপদে।

স্বপ্ন-ভেজা দিন

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

দুটি প্রজাপতি উড়ছে ফিরছে
হলদে খয়েরি ডানায়;
যেন ওরা দুটি খুশীর ধরণা
পূর্ণ কানায় কানায়।
এখানে সেখানে ঝরঝর ঝরে
শুভ্র ফুলের প্লাবন;
রোদ্দুর পাতে সোনার আঁচল
ভরে প্রান্তর গাঁ-বন।

দুটি বুনো পাখি নাচছে গাইছে
জারুল গাছের শাখায়।
সারাটা আকাশ সুনীল নয়নে
পৃথিবীর পানে তাকায়।
ফুলের সুরভি ছড়িয়ে ছিটিয়ে
কি ঢেউ আসছে হাওয়ার;
সময় হল কি খোকা ও খুকুর
স্বপ্নের দেশে যাওয়ার!

কিম্ভূতের পুঁথি

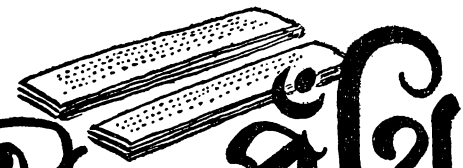

আশাপূর্ণা দেবী

"কিন্তু পর পর সব কথা কি লিখতে পারবো আমি? লিখতে বসে সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। খেই হারিয়ে যাচ্ছে। আগের কথাটা পরে এসে যাচ্ছে, পরের দিকের কথাটা আগে। আমি তাই নির্বুদ্ধির ঢেঁকি সেই ছোট ছেলেটাকে যেন দূর থেকে দেখি। কত বড় ছেলেটা গণেশের পাল্লায় পড়েছিল। কত বড় ছেলেটা সে পাল্লা থেকে পালিয়েছিল। নদীতে নাইতে গিয়ে কুমীরের মুখে পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছিল যে ছেলেটা, সেই বা কত বড়টি ছিল। আর ও কত!

ওই ছেলেটা যেন আমার সামনে ঘুরছে ফিরছে। মার খাচ্ছে, লুকিয়ে কাঁদছে, নতুন দেশে গিয়ে পড়ে নতুন দৃশ্য দেখে গলে গিয়ে হাঁ করে তাকাচ্ছে, রেল লাইন ধরে ছুটতে ছুটতে তাদের সেই বর্ধমান জেলার গ্রামে ফিরে যাওয়া যায় কিনা দেখতে দল থেকে লুকিয়ে পালিয়ে গিয়ে ছুটতে ছুটতে বেদম কাহিল হয়ে, অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। আবার জ্ঞান হয়ে দেখছে দলের লোকেরা তাকে হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে নিয়ে আসছে। ছবির পর ছবি। ছবিগুলো যেন ছুটোছুটি করছে, তবু চেষ্টা করছি পর পর গুছিয়ে লিখতে।

সেদিন—সেই প্রথম দিন—

ঘুম ভেঙে দেখলাম সেই গরুর গাড়াটার গরুগুলো খুলে নিয়ে মাঠে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে আর গাড়ীটা যেন মুখ হেঁট করে পড়ে রয়েছে। তোড়জোড় চলছে খাওয়া দাওয়ার। একটা গাছতলায় ইঁট পেতে উনুন বানিয়ে তাতে কাঠ জ্বেলে মাটির হাঁড়ি বসানো হয়েছে। লোক দুটো, হয়তো গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানই হবে, চাল টাল ধুচ্ছে না কি করছে।

আমি সেই মাথা হেঁট করে পড়ে থাকা গাড়ীটার মধ্যেই ঘুমোচ্ছিলাম, ঘুম ভাঙতে প্রথমটা যেন দিশেহারা হয়ে গেলাম। এ কীরে বাবা! আমি কোথায়? আমাদের সেই রঙিন দেওয়াল-ওয়ালা ঘরটা কই? আমার চারিধারে মশারির দেওয়াল কই? আমাদের সেই মার্বেল পাথরের

মেজের পুব জানলা দিয়ে এসে পড়া সকালের রোদ্দুরটা কই? আমার গায়ে এ কিসের পোশাক? চড়া রোদ্দুরে ভরা মাঠে এই কিম্ভূত কিমাকার পোশাকটা পরে আমি একখানা ভাঙা গরুর গাড়ীতে পড়ে আছি, এর মানে কি?

আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

না আমাকে ভূতে উড়িয়ে নিয়ে তেপান্তরের মাঠে আছড়ে ফেলে দিয়ে গেছে?

ভাবতে ভাবতে আস্তে আস্তে সব মনে পড়ে গেল। ভূতই বটে। আমার দুর্মতির ভূত। সে আমার ঘাড়ে ধরে এইখানে এনে ফেলেছে। ওই দুটো লোকের মধ্যে একটাকে এখন চিনতে পারছি, ও সেই গণেশ, সার্কাসের কর্তার চাকর। ওই পাজীটাই তো আমাকে কাল যা-তা বলছিল।

উঠে পড়ে গাড়ীটা থেকে নামতে চেষ্টা করতে গিয়েছিলাম, প্রথম নম্বরই হেরে গেলাম। বাঁশের খোঁচায় পাটা ছড়ে গেল। 'উঃ' করে উঠলাম আমি।

ওই 'উঃ'টা শুনে গণেশ আমার দিকে সরে এলো, হা হা করে বলে উঠলো, 'এই যে নবাবের জামাইয়ের ঘুম ভাঙলো! ওরে বাপস কী ঘুমের বহর! আমি তো ভাবলাম মরেই গেছে বুঝি। হুঁ বাবা দাওয়াইটি কেমন দিয়েছিলাম। পাছে রাতে পালাস ভেবে দিলাম খাবার জলে ঘুমের ওষুধ গুলে।'

ওর ওই দাঁত বার করা মুখ দেখে ইচ্ছে হলো মাঠ থেকে ঢিল কুড়িয়ে ছুঁড়ে মারি। তবু আমি নিজেকে সামলে অন্যদিকে তাকিয়ে বসে থাকলাম। গণেশ আরো ছ্যাবলা হাসি হেসে বললো, 'তা নবাব সাহেব উঠুন! অঙ্গ তুলুন। প্রাতঃকেত্য সেরে নিয়ে খেয়ে টেয়ে নিতে হবে তো? আবার তো এই গরুর গাড়ী!'

যদিও আমার চোখ ফেটে জল আসছিল, তবু জোর গলায় বললাম, 'বয়ে গেছে আমার তোর সঙ্গে আবার গরুর গাড়ী চড়তে। বয়ে গেছে তোর ওই পচা রান্না খেতে। আমি যেখানে ইচ্ছে চলে যাবো।'

গণেশ হা হা করে হেসে উঠলো। অনেকক্ষণ ধরে হাসলো। তারপর বলে উঠলো, 'ওরে নেতাই, শোন শোন—রাজপুত্তুরের কথা শোন। পচা রান্না খাবে না, আর আমাদের সঙ্গে যাবে না। ব্যাটা ঘুঘু দেখেছে ফাঁদ দেখেনি, ব্যাং দেখেছে সাপ দেখেনি।' বলে লহরে লহরে হাসতে লাগলো।

তারপর হঠাৎ আমার আরো কাছে সরে এসে জিভে একটা চুক-চুক শব্দ করে সে বললো, 'আহারে যশোদার গোপাল, কেন তোর এই মতিচ্ছন্ন হলো বল দেখি? কে তোকে এ কুপরামর্শ দিল? তোকে দেখে আমার দুঃখ হচ্ছে।'

ওর ওই পাজীর মত কথা শুনে আমার আরো রাগ চড়ে গেল। আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'আমাকে দেখে আর দুঃখু করতে হবে না তোমায়। আমি আজই চলে যাবো।'

'যাবি বুঝি ? কোথায় যাবি ?'

আমি চেষ্টা করে গরুর গাড়ীর সেই খোঁচাটা বাঁচিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ে বললাম, 'আমি কোথায় যাবো, তা তোকে বলতে যাবো কেন ? যেখানে ইচ্ছে সেখানে চলে যাবো।' বলেই হঠাৎ জোরে ছুট মারলাম।

ছুট দিয়ে যদি চলে যেতে পারতাম। যদি কোন ভদ্রলোকের কাছে পৌঁছে গিয়ে আমার গ্রামের হদিস পেয়ে যেতে পারতাম, তা হলে হয়তো—কিন্তু চলে যাওয়া হলো না।

আমি ছুট মারতেই গণেশ হৈ-হৈ করে উঠলো। আর সে নেতাই নামের লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। ব্যস—হয়ে গেল আমার পালানো। আমাকে এরা দু'জনে মিলে জাপটে ধরে বেশ ঘা কতক বসিয়ে দিয়ে বললো, 'ও চেষ্টা করিসনে বাপু, নিজেও মরবি, আমাদেরও মারবি। তার চেয়ে বাবা যা মনস্থ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিস তাই কর। ক'দিন পরেই রামচন্দ্রপুরে আমাদের তাঁবু পড়বে, সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি তোকে। ক'টা দিন গোকুলে বাড়বি চল, তারপর পার্টি এসে যাবে, অধিকারী তোর ভার নেবে।···দাঁতে দাঁত দিয়ে সয়ে থাকবি কিছুকাল, খেলাগুলো সব শিখে নিবি—তারপর বুঝলি কিনা—।'

গণেশ আমার আরো কাছে সরে এসে ফিসফিসিয়ে বলে, 'তারপর ওই অধিকারীটাকে কলা দেখিয়ে লম্বা দিবি, বুঝলি ? পালাবি—স্রেফ দল ছেড়ে পালাবি। একদিন ইচ্ছে করে অধিকারীর সঙ্গে ঝগড়া বাধাবি, খুব চোটপাট শুনিয়ে দিবি তারপর বলবি রইল তোমার চাকরি, আরো অন্ত

সার্কাস পার্টি আমায় পায়ে ধরে সাধছে।—বলে সাহেবের নাকের সামনে দিয়ে গট-গট করে চলে যাবি।'

আমি ওর একটানা কথা শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। থামলে বললাম—'কেন? অত ঝগড়া করবার আমার দরকার? চলে যাবো তো চলেই যাবো।'

গণেশ একটুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে কেমন করে যেন হেসে বলেছিল, 'বড্ড বাচ্চা তুই, তোকে আর কী জ্ঞান দেবো? তবে শোন—সবাই তাই যায়, বুঝলি? একে একে দেখলাম তো ক'টাকে। খেলা শেখে, সাহেবের সুয়ো হয়ে অন্য সবাইকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। সাহেব তাকেই তোয়াজ করে করে বেড়ায়, তার জন্যে ভাল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে। তারপর সে একদিন ঝগড়া করে যাচ্ছেতাই গালমন্দ করে চলে যায়।'

অবাক হয়ে গিয়েছিলাম ওর কথা শুনে। হ্যাঁ তখন তো পৃথিবীর কিছুই জানতাম না। তাই অবাক হতাম। এখন আর বেশী কিছুতে অবাক হই না। কিন্তু তখন হতাম, তাই বলেছিলাম, 'কেন? সাহেব যদি ভালবাসে তা হলে যায় কেন?'

গণেশ আবার ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করে হেসে উঠলো। ভাঙা-ভাঙা গলায় বলে উঠলো, 'বুঝবি, বুঝবি, কেন যায় বুঝবি।' আবার হঠাৎ গম্ভীর গলায় বলে, 'ওই ভালবাসাটা যে কত মিথ্যে তা বুঝতে পারে বলেই চলে যায়, জানিস? ও হচ্ছে শুধু স্বার্থের ভালবাসা। সেইটা বুঝতে পারে আর এতকালের অত্যেচার অবিচারটা মনে পড়ে, তখনই ক্ষেপে যায়, বুঝলি? যাবে না ক্ষেপে?' গণেশের মুখটা হঠাৎ যেন আগুনের মতন হয়ে ওঠে। বলে ওঠে, 'মানুষ তো তারা? জন্তু-জানোয়ারের মতন ব্যাভার পেয়ে পেয়ে আক্রোশ জমে না? এই তোরও জমবে। পালাতে দেবে না, কুকুর-শেয়ালের মতন ব্যাভার করবে। আর বাঘ-সিংহী পোষ মানানোর কায়দায় আফিং খাইয়ে খাইয়ে আর চাবুক মেরে মেরে শায়েস্তা রেখে খেলা শেখাবে। হবে না আক্রোশ? দলের কাউর যদি এতটুকু মায়া-মমতা পড়ে তোর ওপর, ওই মনিবের ভয়ে সেটা প্রকাশ করতে পারবে না।'

গণেশ আবার কেমন উদাস হয়ে যায়, উদাস-উদাস গলায় বলে, 'না, প্রকাশ করতে পারবে না। প্রকাশ করতে গেলেই চাবুক। বুঝলি? এই সার্কাসের খেলায় জন্তু-জানোয়ার নিয়ে কারবার করতে করতে লোকটা নিজেও জানোয়ার বনে গেছে, অন্যকেও জানোয়ার বানিয়ে রেখেছে।··· যে একেবারে বলতে পারে না, সে পালায়। আর নচেৎ এই গণেশ বাহাদুর!'

নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে আবার হা-হা করে হেসে ওঠে গণেশ, 'এই গণেশ বাহাদুরটি হচ্ছে আদি অন্তকালের! সে ওই মনিবকে কবরে দিয়ে, তবে নিজে ভিতরে যাবে। তাই জানোয়ার বনে বসে আছে।'

আমি ওর মুখে খুব একটা দুঃখের ছায়া দেখেছিলাম। সেই অতটুকু বেলাতেও সেটা আমার

চোখে পড়েছিল। তাই আমি বলে ফেলেছিলাম, 'তা তুমিই বা একদিন ঝগড়া করে চলে যাও না কেন?'

'চলে যাই না কেন?' গণেশ খামোকা রেগে উঠলো। বললো, 'এটা তো আচ্ছা ডেঁপো ছেলে দেখছি। বলি চলে যাবো কোন্ মুখে রে? জানোয়ার বনে গেছি বলে কি সত্যি জানোয়ার? মানুষের ঘরে জন্মাইনি? মানুষ মার দুধ খাইনি? তা হলে? এত বড় নেমকহারাম হবো? ও আমায় রাস্তা থেকে কুড়িয়ে বাঁচায় নি? বানের জলে মা-বাপ ভেসে গেল। ঘর-বাড়ি ভেসে গেল, রইলাম একা এই হতভাগা আমি। রাস্তায় পড়ে মরছিলাম—'

আমি কাতর হয়ে বলি 'ইস! কোন্ দেশে ছিলে তুমি? কোন্ নদীর বানে—'

ওমা কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই গণেশ যেন মারমুখী হয়ে উঠলো। কড়া গলায় বললো, 'বলি সকালবেলা বসে বসে আড্ডা দিলেই চলবে? গিলতে হবে না? খেতে হবে না? কাল থেকে তো পেটে অন্নদানা দিইনি। যা ওই পুকুরে মুখ ধুয়ে আয়। ও না থাক, রাজপুত্তুর আবার গড়িয়ে পড়ে ডুবে মরবেন। নেতাই, তোর ওই বালতিটা করে এক বালতি জল এনে দে দিকি। ছোঁড়া মুখ-হাত ধুক। বাঁচিয়ে বর্তিয়ে নিয়ে যেতে হবে তো—তুই হারামজাদা পাজী! বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে আমার মাথা কিনেছেন!'

এই হচ্ছে গণেশের প্রকৃতি।

কখনো মনে হয় বুঝি ভাল লোক, কখনো মনে হয় স্রেফ শয়তান।

তবু ক্রমশঃ ওর কাছাকাছি থাকতে থাকতে মনে হতো, হয়তো শয়তান নয়, ভালই। শুধু 'ভালত্ব'টা প্রকাশ করবার উপায় নেই বলেই শয়তান সেজে থাকে।

উপায় কেন নেই?

পালিয়ে কেন যায় না?

সে কথা তো বলেইছে সে। আরো অন্য সময় বলেছে, 'নেমকহারামী করতে পারবো না।' বলেছে 'এখন আমি যদি চলে যাই লোকটাকে মরণকালে দেখবে কে? তিন কুলে কেউ আছে ওর? আর দলের লোকের সঙ্গে যা ব্যাভার করে, তাতে তো ও যেই মরবে, সবাই ওর টাকাকড়ি নিয়ে টিয়ে মড়া ফেলে চম্পট দেবে; মড়াটার সৎকারও করবে না।'

আমি বলতাম, 'ও আবার মরবে? ও তো একটা আস্ত শয়তান। শয়তানরা কি মরে? ভগবানের মতন শয়তানও তো অমর।'

গণেশ সন্দেহের গলায় বলতো, 'এ কথা তোকে কে বলেছে?'

কে বলেছে বলতে গেলেই তো আমার চোখে জল এসে যেতো মা। তোমাদের মনে পড়ে গিয়ে বুকটা ফেটে যেতো। দেয়ালে মাথা খুঁড়তে ইচ্ছে করতো, নিজের হাতপাগুলো নিজে চিবোতে বাসনা জাগতো। মনে পড়ে যেতো সেই আমার পড়বার ঘরটার চেহারা; আর সেই মাস্টার

মশাইদের মুখ। তখন যে মুখ দেখলে ভয় করতো, রাগ ধরতো, সেই মুখই দেবতার মুখের মতন মনে হতো। গণেশ আমার মুখে মাস্টারের কথা শুনে প্রশ্ন করেছিল, 'কোন্ মাস্টার মশাই?' কষ্টে ওর প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলাম, 'যে মাস্টার মশাই পড়াতেন!'

গণেশ ওর অভ্যেস মতন হঠাৎ রেগে উঠে বলতো, 'এই—এই জন্যেই তোকে আমার জ্যান্ত পুঁততে ইচ্ছে করে পাজী! কুকুর দিয়ে খাওয়াতে ইচ্ছে করে। মা ছিল, বাপ ছিল, মাস্টার ছিল, ঘরে ভাত-কাপড় ছিল, আর তুই কিনা চলে এলি এই সলোমান সাহেবের সার্কাস পার্টিতে! ছি ছি! ইচ্ছে হয় মুঠো মুঠো ধুলো তুলে তোর গায়ে দিই।'

আবার হঠাৎ গম্ভীর গলায় বলতো, 'তোর মাস্টার ভুল বলেছে। শয়তানও মরে। ওই শয়তানটার মরণ রোগ ধরেছে। দেখিস না চেঁচাতে চেঁচাতে হঠাৎ কুঁকড়ে কুঁকড়ে পেট চেপে ধরে।···ওইটিই রোগ। ডাক্তার দেখায় না; বলে, 'ডাক্তার এসে রুগী বানিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেবে। তার থেকে যতদিন বাঁচি লীলা-খেলাটা করে যাই।' তাই করছে লীলা-খেলা। এই দুনিয়াটা বড় মজার জায়গা, বুঝলিরে ছোঁড়া। যত দেখবি, টের পাবি। আর এই মানুষগুলো? আজব জীব। দুনিয়ায় যত জীব জন্তু পাখী গড়েছে ভগবান, সবাইয়ের 'নির্য্যেস' দিয়ে গড়েছে এই মানুষ জাতটাকে। তাই এই মানুষের মধ্যে সাপ আছে, ব্যাঙ আছে, বাঘ আছে, সিংহী আছে, হাতী, মোষ, বুনো শূয়োর, হরিণ, ভেড়া, গণ্ডার, ভালুক, কুকুর, বেড়াল, ধেড়ে ইঁদুর, ছুঁচো, ঈগল মায় কুমীর, হাঙর পর্যন্ত, কত নাম আর করবো—সব সব, সবাইয়ের প্রকৃতি গোঁজা আছে। এক এক মানুষের মধ্যে এক একজনের গুণ। আর ওই সলোমন সাহেবের মতন শয়তানদের মধ্যে অনেকের গুণ।'

আমি বললাম, 'তবুও তো ওকে ভালবাসতে ছাড়ো না।'

'ভালবাসা?' গণেশ বলতো, 'থু থু! ভালবাসার লোক পেলাম না আমি? ওই তো বললাম, ওকে কবরে না দিয়ে নড়বার উপায় নেই আমার, তাই পড়ে আছি।'

বলতো, তবু ওদের সঙ্গে থাকতে থাকতে আমি বুঝতে পারতাম ভালবাসে। অদ্ভুত এক রকমের ভালবাসে। খাঁচায় পোরা বন্য জন্তুগুলো যেমন এক রকম ভালবাসে তাদের 'মাস্টার'কে। সেই ভালবাসার বশেই আটকে পড়ে আছে গণেশ সলোমন সাহেবকে কবরে দেওয়া পর্যন্ত।

* * *

কিন্তু শেষ রক্ষে কি করতে পেরেছিল গণেশ? পারেনি। সলোমন সাহেব পেট চেপে ধরে ধরেও অনেকদিন বেঁচে থেকেছে। ও থাকতে থাকতেই গণেশ ওকে ছেড়ে চলে গেল।

আমি তখন পুরো দমে খেলা শিখেছি।

অথবা আমাকে শেখানো হচ্ছে চাবকে চাবকে।

ওঃ কী অকথ্য সেই যন্ত্রণা মা! যত দেহের ওপর পীড়ন, তত মনের ওপর। দেহে তো—

চাবুক মেরেছে, লোহা পুড়িয়ে পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিয়েছে, হাতপা ঠিকমত মোচড় খাওয়াবার জন্যে দড়ি দিয়ে উল্টোদিকে মুচড়ে বেঁধে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফেলে রেখেছে। আরো কত কীই করেছে মা গো, সে আর বেশী বলতে চাই না। তুমি যখন পড়বে তখন শিউরে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবে হয়তো। শুনেছি জেলখানার আসামীদের নাকি অনেক ভীষণ ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা দেয়। সে কি এর থেকেও বেশী? কে জানে।

তা ছাড়া মনের ওপর যে কষ্ট!

ওঃ সে কী লাঞ্ছনা—কী অপমান! একদিকে আমি নিজের মুখ্যুমীর জন্যে অনুতাপে জ্বলছি, অন্যদিকে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর গালাগাল, কীল গাঁট্টা লাথি! মা মাগো, তোমাদের মনে যে কষ্ট দিয়ে চলে এসেছি, তার চতুর্গুণ নিজেও পেয়েছি।

যাক এসব কথা আর বেশী লিখতে চাই না। তবু মনের পাপ খুলে লিখি মা। রোজ রাত্তিরে—হ্যাঁ তোমার বাবুরামের অধঃপতন দেখে শিউরে উঠবে তুমি—রোজ রাত্তিরে আমি শোবার সময় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতাম: যেন সকালবেলা উঠে দেখি—পেটের ব্যথা বেড়ে গিয়ে সলোমনটা মরে গেছে।

কিন্তু আমি থাকতে আর সে প্রার্থনা পূর্ণ হলো না আমার। নিত্যি নতুন জায়গায় তাঁবু গেড়ে গেড়ে খেলা দেখিয়ে বেড়াতেই লাগলো সাহেব।

আর গণেশও বিচিত্র ব্যাভার করে করে আমাকে কখনো শান্ত করে রাখতো, কখনো ক্ষেপিয়ে তুলতো। ক্রমশঃই বুঝতাম কেন ও অমন করে। পাছে আমার ওপর মায়া পড়ে যায়, পাছে আমাকে ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে তাই অমন করে মায়া-মমতার ঘরটাকে জোরে জোরে দরজা বন্ধ করে রাখতো। ছেড়ে দিলেই তো সলোমনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা হবে। সেইটি পারবে না গণেশ। অথচ আমার ওপর মায়া পড়ে যাচ্ছে।

তাই একটু একটু ভাল ব্যাভার করে ফেলেই নিজেকে সামলে নিতো, খিঁচিয়ে উঠে বলতো, 'বসে বসে গালগল্প করতে হবে তোর সঙ্গে? উল্লুক কাঁহাকা! বেরো আমার সামনে থেকে দু'চক্ষের বালাই।'

আর সলোমন সাহেব ধারে কাছে থাকলে তো কথাই নেই, গালাগালের ছড়া বইয়ে দিতো একেবারে। 'পাজী গাধা উল্লুক বদমাইস, বুনো শূয়োর, খ্যাঁকশেয়ালী' কিছু বলতে বাকি রাখতো না। আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতো, 'শক্ত রুটি খেতে পারবেন না, পচা মাছ খেতে পারবেন না, চাকরের কাজ করতে পারবেন না, ভারী আমার নবাব এসেছেন। এতই যদি বাবুয়ানা তো এলি কেন জমিদার বাপের বাড়ি ছেড়ে? বদমাইস!'

বুঝতাম এসব সলোমন সাহেবের মন রাখতে বলছে। সাহেব তা হলে নিশ্চিন্তি থাকবে, জানবে গণেশ আমায় দু'চক্ষে দেখতে পারে না। ওর চালাকি সফল হতো।

সলোমন তাই শুনে শুনে নেকড়ের মতন দাঁত বার করে হাসতো, আর বলতো, 'তা দিস গণেশ, হারামজাদাকে একটু দুধ-ঘি মাছ-মাংস দিস। চ্যাহারাটা বহুৎ বড়িয়া আছে, 'তাওত' করলে ব্যাটা সত্যিই রাজপুত্তুয়ের মতন দেখতে হয়ে উঠবে।'

গণেশ মুখ বাঁকিয়ে বলতো, 'দায় পড়েছে আমার ওই বিচ্ছুটাকে যত্ন করতে। জানেন না তো সাহেব, ছোঁড়া কত বড় বিচ্ছু। উঠতে বসতে চাবুকের ওপর আছে তাই—'

বলতো, আবার খাবার সময় গরম দুধের গেলাস এনে সামনে বসিয়ে দিতো, মাছ-মাংস নিজে এনে পাতে ঢেলে দিতো, আর কেমন চাতুরী করে সলোমন সাহেবের 'স্পেশাল খানা' থেকে লুচি বাগিয়ে এনে আমায় ধরে দিতো।

মা গো ঘেন্নায় তোমার নাক কুঁচকে যাচ্ছে বোধ হয়? ভাবছো কত নোংরা জিনিসই খেয়েছে বাবুরাম, কত ময়লা লোকের ছোঁওয়া। অথচ বাবুরামের পৈতে হয়েছিল! বিশুদ্ধ কলসীর জল খেতো!

কি করবো! সবই নিয়তি!

আছি যখন ওদের মধ্যে, খেতে তো হবেই। তবে ওই সব আদর দেখাতে এলেই প্রথমটা রেগে জ্বলে যেতাম। বলতাম, 'নিয়ে যা আর আদর দেখাতে হবে না। চাই না আমি ওসব খেতে। দয়া দেখাচ্ছে।'

তখন গণেশ কেমন যেন কাঁদো-কাঁদো চোখে তাকাতো। আর বলতো, 'এত তোর বুদ্ধি, আর এটুকু বুঝিস না কেন রে? দয়া আমি তোকে দেখাচ্ছি না, নিজেকেই দেখাচ্ছি। তুই একটু ভাল খেলে টেলে তবু আমি—। দেখ তো কী জীবন আমার।'

অগত্যাই খেতে হতো। ওর ওপর মায়া হতো।

আর ক্রমশঃ ওকেই একমাত্র আপনার লোক মনে হতো।

ওকে আমি 'গণেশদা'-ও বলতে শুরু করেছিলাম। ওর পায়ে পায়ে ঘুরতাম আর বলতাম, 'কবে আমায় বাঘের খেলা শেখাবে তোমরা গণেশদা?'

বাঘের খেলার ওপরই আমার আসল ঝোঁক। ঠিক করে রেখেছিলাম ওটা শিখে ফেলেই পালাবো। নির্ঘাৎ পালাবো। ঝগড়া করে নয়, এমনিই। পালিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়ে মাকে সব বলে টলে তারপর বলতাম মনের কথা। বলতাম 'মা, আমার বড় ইচ্ছে নিজেই একটা সার্কাস খুলবো আমি। তুমি আমার সহায় হও।'

ধীরে ধীরে বড় হচ্ছিলাম, নিজের ওপর বিশ্বাস আসছিল, খুব তাড়াতাড়ি খেলা শিখে নিতে পারি বলে বাহবা পাচ্ছিলাম, সেই সময় ঘটলো সেই ঘটনাটা। সেই গণেশের ঘটনা।

আমি তখন ট্রাপিজের খেলা শিখি। সেদিন অনেকক্ষণ খেলা প্র্যাকটিস করে এসে দেখি গণেশ বসে আছে চুপচাপ। যেন মনে ওর কোনো সুখ নেই।

দেখে মন কেমন করে উঠলো।

হঠাৎ ওর কাছে মনের কথা খুলে বলতে ইচ্ছে হলো। বললাম খুলে। সার্কাস খোলার ইচ্ছের কথা। বললাম, 'তোমাকে আর ওই সলোমন সাহেবের মরণকাল পর্যন্ত এখানে পড়ে থাকতে হবে না গণেশদা, তুমি আমার দলে চলে আসবে। তোমাতে আমাতে দু'জনে—'

গণেশ মনমরা মত হেসে বললো, 'অনেক টাকা জমেছে তোর, তাই না? কত জমেছে? পাঁচ সিকে?'

আমি জোরের সঙ্গে বললাম—'আহা তাই বুঝি? খেলাটা শেখা হলেই তো আমি চলে গিয়ে বাবা-মার কাছ থেকে টাকা নেবো। এখনো তোমাদের শাসনে পড়ে আছি, তাই যেতে পারছি না। তখন তো বড় হবো। তা' ছাড়া—খেলাটাও সব শিখে নিতে চাই। তারপর আর কি?'

গণেশ তেমনি ভাবে হেসে বললো, 'তার মানে তখন আমি তোর চাকর?'

আমি বললাম, 'ধ্যেৎ চাকর কি? তুমিই তো দলের কর্তা হবে।'

ও নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'হ্যাঁ এখন তাই বলছিস। তখন—যখন লায়েক হবি—তখন জুতোয় ঠোক্কর মারবি। ছেড়ে দে কথা। দেখলাম দুনিয়ার সব ব্যাটাকে। আর মনে ভাবছিস তোর বাবা আহ্লাদ করে তোকে সার্কাস পার্টি গড়তে টাকা দেবে? সে আশা কোরোনি যাদুমণি! দুনিয়াটা পরীর রাজ্য নয়।'

আমি হাসলাম। বললাম, 'আমার মা-বাবাকে তো দেখোনি তুমি। আমাকে হারিয়ে ফেলে তাঁদের কী অবস্থা তাও জানো না। আমাকে আবার পেলে যথাসর্বস্ব দিয়ে দিতে পারবেন।'

গণেশ নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'তা হবে। মা-বাপ যে কেমন বস্তু, ভুলেই গেছি।'

আমি সেদিন খেলায় খুব বাহবা পেয়েছি, মনটা ভাল আছে। হেসে বললাম, 'তোর আজ কি হলো বল তো গণেশদা? কেবল কেবল নিঃশ্বাস ফেলছিস।'

গণেশ বললো, 'নাঃ, হবে আবার কি? বসে বসে হিসেব করছিলাম জীবনের মানেটা কি। তা হিসেবটা মেলাতে পারছি না বলেই—'

আমি আস্তে ওর একটা হাত ধরলাম।

বললাম, 'ওসব চিন্তা রাখ গণেশদা, আয় দশ-পঁচিশ খেলি।'

খেলাটা আমায় গণেশই শিখিয়েছিল। এটা তার খুব প্রিয় খেলা। কিন্তু সেদিন গণেশদা আমার প্রস্তাবে হঠাৎ যেন ছিটকে উঠলো। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে খিঁচিয়ে বলে উঠলো, 'যা যা আর মায়া দেখাতে হবে না। যত সব শয়তান! যা ওই সলোমন শয়তানটার পুষ্যি পুত্তুর হয়ে, ওর মেয়েকে বিয়ে করে সুখে রাজ্যি-পাট করগে যা। আলাদা সার্কাস খুলবি কেন, সাহেব তো তোকেই জামাই করে সর্ব্বস্ব দিয়ে যাবে।'

সলোমনের মেয়ে বৌ কোথাও কিছু ছিল না। থাকার মধ্যে সার্কাস পার্টির মেয়ের দল। তাই আমি হেসে ফেলে বললাম, 'ওর জামাই হবার জন্যে আমি আহ্লাদে হাত তুলে বসে আছি। আর মেয়ে কোথায় সাহেবের ?'

'নেই, পুষ্যি নেবে। পুষ্যি মেয়ে, পুষ্যি জামাই নিয়ে আহ্লাদে ভাসবে। আর যারা ওর জন্য জীবন দিচ্ছে তাদের জুতোর ঠোক্কর মারবে।'

বুঝলাম আজ সলোমন ওর সঙ্গে খুব খারাপ ব্যাভার করেছে। তাই বললাম, 'রাত হয়েছে, খাওয়া দাওয়া হোক গণেশদা।'

গণেশ বললো, 'নাঃ এখন না। আগে 'শেরশাকে' খাওয়াই।'

শেরশা হচ্ছে সার্কাসের বাঘের নাম।

এখন ওই একটাই বাঘ আছে। আগে নাকি দুটো ছিল, দেখিনি আমি। তা' শেরশাকে খেতে দেবার ভারটি ছিল গণেশের উপর। কেমন তরতর করে তার খাঁচার ওপর উঠে যেতো, ওপর থেকে একটা ঢাকনি তুলতো, আর সেই গর্ত দিয়ে মাংসের পুঁটুলী ছুঁড়ে দিতো।

বাঘের ঘর পরিষ্কারও করতো গণেশ। সেও—কেমন কৌশলে বাঘটাকে দরজা নামিয়ে খাঁচার একদিকে ঠেলে দিতো, আর অপর দিকটা পরিষ্কার করে ফেলতো।

শেরশা সে সময় ভীষণ গর্জন করতো, খাঁচার দরজায় এসে নাকের ধাক্কা দিতো, আর মনে হতো এক্ষুণি বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বে গণেশের ওপর। কিন্তু কিছুই হতো না। গণেশ দিব্যি হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসতো।

আসলে কিন্তু বাঘের জন্যে আলাদা লোক ছিল—যার নাম গুংটু। কালো বেঁটে কাফ্রীর মত দেখতে, কি জানি কি জাত। তারই বাঘের কাজ করার কথা। কিন্তু গণেশ স্বেচ্ছায় কাজটা শিখে ফেলে স্বেচ্ছায় ওই ভারটা নিজের ঘাড়ে নিয়েছিল। সলোমন সাহেব দেখতে পেলেই গুংটুকে গালাগাল করতো। গণেশ হেসে হেসে বলতো, 'ওর কোনো দোষ নেই সাহেব। আমারই বাঘের মুখে খাবার ধরে দিতে, বাঘের খাঁচায় ঢুকতে ভাল লাগে।'

তা ভাল লাগলেও নিজে খাওয়া দাওয়ার আগে বাঘকে খাওয়াতে যেতো না কোনো দিন। বলতো, 'হাতে কাঁচা মাংসের গন্ধ হয়ে যায়।'

খাওয়া দাওয়ার পর রাত বারোটায় বাঘের খাঁচার মাথায় উঠতো। আমি দেখতাম হাঁ করে। কিছুতেই তার আগে শুতে যেতাম না।

সেদিন বললাম, 'এখন কেন খাওয়াতে যাবে ?'

'যাবো।'

'তোমার হাতে গন্ধ হবে না ?'

'হোক।'

বুঝলাম মনটা ওর বড়ই অন্যমনস্ক আছে আজ।

হয়তো ছিল তাই।

কিন্তু কে জানতো যে এতই অন্যমনস্ক হবে গণেশ যে, খাঁচার মাথায় না উঠে হঠাৎ খাঁচার দরজার চাবি খুলে মাংসের পুটুলী নিয়ে তার মধ্যে ঢুকে যাবে। আর কে জানতো সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা পড়ে যাবে।

কেউ জানতো না।

স্বপ্নেও ভাবেনি কেউ। অথচ ঘটলো সেই ঘটনা। আমাদের চোখের সামনেই ঘটলো। আমি, রান্নার সেই বুড়িটা, সার্কাসের দুটো মেয়ে রীতা আর সইতা, এসেছিল কৌতূহলী হয়ে। আজ সকাল সকাল খাওয়াতে এসেছিল তো গণেশদা। ঘুমিয়ে পড়েনি সবাই।

চাবি খোলার উপক্রম দেখেই চীৎকার করে উঠেছিলাম আমরা—'ও কি? ও কি? দরজা খুলছো কেন? ওপরের খুবরি থেকে তো—'

কিন্তু কথা আমাদের শেষ করা হলো না।

ঝনাৎ করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। আর গণেশদা শেয়শার হিংস্র থাবার নীচে পড়লো!"

* * * *

শিউরে উঠে খাতাখানা বন্ধ করলো টুটু। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো তার, বুকটা হিম হয়ে গেল। একটা লোক—যে নাকি অত দুর্দান্ত দুর্দান্ত কথা কইতো, সবাইকে শাসিয়ে বেড়াতো, আর বাবুরাম নামের সেই অবোধ ছেলেটাকে মুখে তর্জন গর্জন করলেও মনে মনে ভালবাসতো, সে কিনা হঠাৎ ভুল করে বাঘের খাঁচায় ঢুকে পড়লো!···

টুটু কল্পনার চোখে দেখতে চেষ্টা করলো সেই দৃশ্য! কারণ টুটু নিজেকে বাবুরামের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছে। অতএব টুটু কিছুক্ষণ নিথর হয়ে বসে থাকলো। আর সেই সময় টুটু বাবার গলা শুনতে পেলো, 'টুটু কই? তাকে যেন আজকাল আর দেখতেই পাওয়া যায় না। ব্যাপার কি?'

টুটু তাড়াতাড়ি খাতা বন্ধ করে নীচে নেমে এলো।

(ক্রমশঃ)

প্রাচীন বিশ্ব-বিস্ময়

হ্যলিকারনাসাস-এ সমাধি

গোলোকেন্দু ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ কবি। আগ্রার তাজমহল দেখে সাজাহানকে উদ্দেশ করে তিনি বলেছেন, "হে সম্রাট্-কবি, এই তব হৃদয়ের ছবি, এই তব নব মেঘদূত…"। সম্রাট্ সাজাহান রচনা করেছিলেন শ্বেতপাথরের কবিতা সম্রাজ্ঞী মমতাজ-এর সমাধির ওপর প্রায় চারশ' বছর আগে (১৬৩২-১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে)। এমনি আর এক সৌধকবিতা রচনা করেছিলেন রাজ্ঞী আর্টেমেশিয়া স্বামী রাজা মউসোলাস-এর সমাধির ওপর প্রায় তেইশ শ' বছর আগে। সে সমাধি-সৌধ দেখে পরিব্রাজক ফিলন তাকে ঘোষণা করেন অন্যতম বিশ্ববিস্ময়রূপে। সম্রাট্ সাজাহানের হৃদয়ের ছবি তাজমহল, আর রাজ্ঞী আর্টেমেশিয়ার হৃদয়ের ছবি মউসোলিয়াম ; দুটিই বিশ্ববিস্ময়—একটি বর্তমানের, আর একটি প্রাচীন, অবলুপ্ত তবু ইতিহাসের পাতায় ভাস্বর।

জায়গাটার নাম হ্যলিকারনাসাস। গ্রীসের একটি প্রাচীন শহর এটি, এজিয়ান সাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত। এর আগে আমরা জেনেছি, আর একটি প্রাচীন বিশ্ববিস্ময় 'কলোসাস' ছিল রোড্স্ দ্বীপে। রোড্স্ দ্বীপ অবস্থিত ভূমধ্যসাগর ও এজিয়ান সাগর যেখানে মিশেছে। হ্যলিকারনাসাস শহরটি রোড্স্ দ্বীপ থেকে কিছু উত্তরে।

গ্রীক সভ্যতার আদিতে এজিয়ান সাগরের পশ্চিম উপকূলের 'আরগস' ও 'ট্রয়জেন' প্রভৃতি শহর থেকে গ্রীকেরা এসে হ্যলিকারনাসাস-এ বসতি স্থাপন করে। হ্যলিকারনাসাস শহরের প্রত্নতাত্ত্বিক সন্ধানের ফলে যে ছোটখাট মূর্তি, মুদ্রা প্রভৃতি পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে একথা জানা গেছে। হ্যলিকারনাসাস পরে আরগস, ট্রয়জেন প্রভৃতি শহরের প্রভাবমুক্ত হয় ও স্বাধীন হয় এবং আরও পাঁচটি গ্রীক শহরের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়। কিন্তু পরে এই জোট থেকেও বেরিয়ে এসে স্বতন্ত্র হয়। এসব ঘটে যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবার পাঁচশ' বছর আগে।

প্রাচীন সভ্য দেশগুলির মধ্যে একটি দেশ পারস্য। পারস্য ছিল বেশ শক্তিশালী এবং একজন রাজার অধীনে সমস্ত রাজ্যটা শাসিত হত বলে তাদের সামরিক শক্তি ছিল অনেক বেশি কার্যকর। গ্রীস রাজ্য কিন্তু একজন রাজার দ্বারা শাসিত হত না, আলেকজাণ্ডারের আমল ছাড়া (৩৫৬-৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। সারা গ্রীস দেশটাই পাহাড়-পর্বতে ভরা। দূরে দূরে এক একটি শহর, সেই শহর

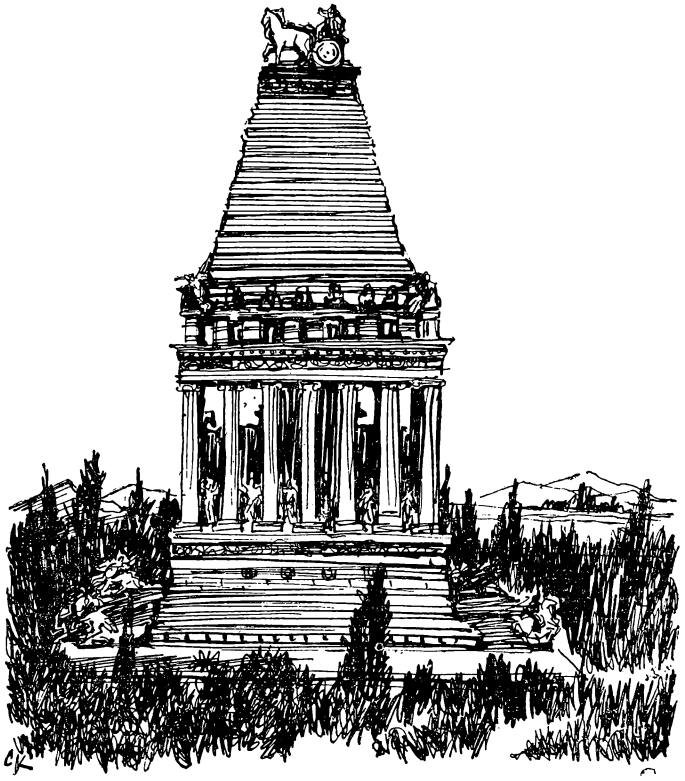

ও শহরতলী নিয়ে এক একটি রাজ্য। সেই রাজ্যটাও কোন একজন রাজার দ্বারা শাসিত হত না। প্রধান অবশ্য একজন প্রায়ই থাকতেন; কিন্তু রাজ্যটা শাসিত হত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা। একে বলত সিনেট। গ্রীকদের নিজেদের মধ্যে আবার ঝগড়া-লড়াই লেগেই ছিল। শত্রু আক্রমণ করলে কখনও কখনও তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বিদেশীদের আক্রমণ রুখত; আবার কখনও তাদের মধ্যে কেউ হয়ত নিষ্ক্রিয় থাকত, কেউ আবার বিদেশী আক্রমণকারীর পক্ষ নিত।

এই রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল পারস্যের রাজা জারেক্স পঞ্চম খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যখন গ্রীস আক্রমণ করেন। এই সময়ে হ্যলিকারনাসাস-এর প্রধানা বা রাজ্ঞী আর্টেমেশিয়া পারস্যরাজ জারেক্স-এর পক্ষ নেন এবং তাঁকে পাঁচটি জাহাজ দিয়ে সাহায্য করেন (৪৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। এর পর হ্যলিকারনাসাস্ হয়ে রইল পারস্যের অধীন। পারস্যের অধীনতা থেকে হ্যলিকারনাসাসকে মুক্ত করলেন রাজ্ঞী আর্টেমেশিয়ার স্বামী মউসোলাস সত্তর বছর পরে (৩৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে)। মউসোলাস একজন যোগ্য শাসনকর্তা ছিলেন। দেশকে পারস্যের অধীনতা থেকে মুক্ত করে রোড্স্ দ্বীপ দখল করেন এবং একটি শক্তিশালী নৌবহর গঠন কয়ে যান।

ইতিহাসে যেসব নায়কেরা অসমসাহসিক বীরত্ব দেখিয়ে নিজেদের নামের স্বাক্ষর রেখে গেছেন, মউসোলাস অবশ্য তাঁদের একজন নন। কিন্তু তবু মউসোলাস-এর নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থায়ী হয়ে রইল স্ত্রী আর্টেমেশিয়া-রচিত তাঁর সমাধি-সৌধের অপূর্ব লাবণ্য ও ভাস্কর্যের জন্যে।

মউসোলাস মারা গেলেন ৩৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। রাণী আর্টেমেশিয়ার বুকে এ ব্যথা গভীরভাবে বাজল। তিনি চাইলেন তাঁর স্বামীর স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করে রাখতে। স্বামীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে তিনি এক সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু এ সাময়িক। স্বামী মউসোলাস-এর সমাধির ওপর এমন এক সমাধি-মন্দির তৈরি করার সংকল্প করলেন যা তাঁর স্বামীর নামকে কালজয়ী করে রাখবে। এ চেষ্টা তাঁর সফল হয়েছে। সমস্ত সমাধি-মন্দিরকেই বলা হয় 'মউসোলিয়াম'। মউসোলিয়াম কথাটার সঙ্গে তাঁর স্বামী মউসোলাস-এর নামটা জড়িত হয়ে চিরস্থায়ী হয়ে রইল।

মউসোলাস-এর সমাধি-সৌধ মউসোলিয়াম ছিল শ্বেত-পাথরের তৈরি। সাদার এক সৌন্দর্য আছে। সমুদ্রপথে যারা হ্যলিকারনাসাস শহরে আসত দূর থেকে এই অপরূপ শ্বেত-সৌধ দেখে প্রথম দর্শনেই তারা অভিভূত হয়ে পড়ত। কাছে এসে দেখত, বিরাট চৌকো এক উদ্যান যার এক পাশের মাপ হল ৪৯৯ ফুট। উদ্যানের সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীর পেরিয়ে ভেতরে এসে দেখত উদ্যানের মাঝে আয়তাকার (রেক্টাঙ্গুলার) সৌধটি। সৌধটি ১৪০ ফুট উঁচু। সৌধের পাঁচটি ভাগ। সর্বনিম্নে মঞ্চ বা প্ল্যাটফর্ম। এটি মূলত সবুজ পাথরের তৈরি। মাঝে মাঝে শ্বেত-পাথর দিয়ে একঘেয়ে সবুজ ভাবটা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগটি—মঞ্চের ওপর একটা উঁচু ভিত্তিভূমি, তার সীমানা ঘেঁসে চারদিকে ৩৬টি লম্বা স্তম্ভ।

গ্রীক ভাস্কর্যে স্তম্ভের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। গ্রীক ভাস্কর্যের অনুসরণে তৈরি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হাউসের স্তম্ভগুলির যে গাম্ভীর্য ছিল সে ভোলার নয়। মউসোলিয়াম-এর স্তম্ভগুলির মাঝে সম্ভবত ছিল বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি। স্তম্ভগুলির নিচের ভিত্তিভূমির গায়ে ছিল পাথরে খোদাই-করা গ্রীক-আমাজন যুদ্ধের দৃশ্য। এই দৃশ্যগুলি ছিল রঙীন। গ্রীক ভাস্কর্যের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল—সোনালী, সবুজ, লাল, সাদা প্রভৃতি নানা রঙের পাথরের সমন্বয় করা। অত্যন্ত নিখুঁত ছিল খোদাই-এর কাজ। স্তম্ভগুলি ছিল শ্বেত-পাথরেব কিন্তু সোনালী আভা বেরুত তা থেকে। ভূমি থেকে স্তম্ভের পাদদেশ পর্যন্ত উঠতে হত পাথরের সিঁড়ি বয়ে। সিঁড়ির দুপাশে সাজান পাথরের তৈরি সিংহের মূর্তি। সৌধের তৃতীয় ভাগ—স্তম্ভের ওপর ছাদের যে-অংশ পিরামিডের মত ঢাল হয়ে উঠেছে ২৪টি ধাপে। চতুর্থ ভাগ—এর ওপর একটি মঞ্চ এবং পঞ্চম ভাগে শীর্ষদেশ। শীর্ষদেশে পাথরের তৈরি চার ঘোড়াযুক্ত একটি রথ। রথের আরোহী মর্মরমূর্তি দু'জন। একজন মউসোলাস, আর একজন নারী—কেউ কেউ বলেন, দেবী আথীনী। কিন্তু সম্ভবত সেটি ছিল রাণী আর্টেমেশিয়ার মূর্তি।

রাণী আর্টেমেশিয়া এই অপরূপ লাবণ্যযুক্ত গ্রীক ভাস্কর্যেরও বিস্ময়, অন্যতম বিশ্ববিস্ময়, স্বামী মউসোলাসের স্মৃতি-সৌধের সমাপ্তি দেখে যেতে পারেননি। এই স্মৃতি-সৌধই তাঁর হৃদয়ের ছবি ছিল কি না জানি না, কারণ সৌধটি সমাপ্ত হবার আগেই, স্বামীর মৃত্যুর দু বছর পরে তিনিও মরলোক ছেড়ে যান। তবে তাঁর নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। সারা গ্রীকজগৎ খুঁজে তিনি শ্রেষ্ঠ ভাস্করদের সমবেত করেছিলেন। এঁদের কয়েকজনের নাম জানা যায়—সাতিরাস্, পিথ্স্, স্কোপাস্, লিওকারেস্, ব্রিয়াক্সিস্, টিমোথিন্স্।

স্বামীর মৃত্যুতে রাণী আর্টেমেশিয়া শোকে ভেঙে পড়েন বটে, কিন্তু যথাসাধ্য কর্তব্য করে গেছেন। মউসোলাস মারা গেলে রোড্স্বাসীরা হ্যলিকারনাসাস আক্রমণ ওরার চেষ্টা করে। কিন্তু আর্টেমেশিয়া যুদ্ধে তাদের পরাস্ত করে তাদের নৌবহর ধ্বংস করে দিয়ে নতি স্বীকার করান। কিন্তু স্বাস্থ্য তাঁর ভেঙে পড়ে শোকে ও কর্মভারে। তিনি মারা যান স্বামীর মৃত্যুর মাত্র দু বছর পরে। তাঁর নিষ্ঠা ও স্বামীর প্রতি ভালবাসার গভীরতা দেখে, ভাস্করেরা মাঝপথে কাজটা বন্ধ করেন নি, স্বেচ্ছায় সম্পূর্ণ করে দিয়েছিলেন।

আর্টেমেশিয়া রচিত এই স্মৃতি-সৌধ প্রায় দেড় হাজার বছর পৃথিবীর বুকে টিঁকে ছিল। দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত খ্রীষ্টান জগতে চলেছিল দারুণ লড়াই। এই সময়ে প্যালেস্টাইনকে কেন্দ্র করে ভূমধ্যসাগরে নানা দ্বীপে ও কাছের দেশগুলির গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে খ্রীষ্টান সম্প্রদায় দুর্গ তৈরি করেছিল। এই রকম একটি দুর্গ তৈরি করতে আসে ১৪০২ খ্রীষ্টাব্দে সেণ্ট জন সম্প্রদায়। হ্যলিকারনাসাস শহরের নাম হয় তখন বার্দুস। তারা কাছাকাছি পাথরের অভাব দেখে এই সৌধের পাথর ব্যবহার করতে শুরু করে। তাতে স্মৃতি-সৌধের বেশ খানিকটা ধ্বংস হয়। পঞ্চাশ বছর পরে সুলতান সুলেইমান আক্রমণ করে দুর্গের ক্ষতিসাধন করেন। তারপর ১৫২২ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গ পুনর্নির্মাণের সময়ে স্মৃতি-সৌধের ধ্বংস সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু দুর্গের উপাদানের মধ্যে এর কিছু কিছু অংশ রয়ে গিয়েছিল।

১৮৪৬ সনে শহরটির প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য শুরু হয় ইংরেজদের পরিচালনাধীনে। সার চার্লস নিউটন অশেষ ধৈর্যে মউসোলিয়াম-এর কিছু কিছু অংশ যেমন সিঁড়ির ধারে বসান সিংহের মূর্তি, খোদাই-করা যুদ্ধের দৃশ্যের অংশ-বিশেষ উদ্ধার করেছেন। এগুলি এখন ব্রিটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে, আর আছে একটি ছোট আকারের (৯½ ফুট উচ্চতার) মডেল 'মউসোলিয়াম' স্মৃতি-সৌধের। এটি এ জি স্টীফেনসনের নেতৃত্বে তৈরি। কল্পনা ও বাস্তবনিষ্ঠার অপূর্ব সমন্বয়ের নিদর্শন—এই অন্যতম বিশ্ববিস্ময় আর্টেমেশিয়ার সময়ের ছবি মউসোলিয়াম, তাজমহলের সগোত্র মর্মর-কবিতা।

ফুলটুসি

হিমকর গোস্বামী

ফুলটুসিরে ফুলটুসি !
আজকে যেন খুব খুশী ?
ফুল ফুটেছে
বন জেগেছে
সেই হাসিতে মন জেগেছে ?
ফুলটুসিরে ফুলটুসি !
টুক্‌টুকে লাল টিপ পরেছো
কৃষ্ণকালো চুল ঘসি ?
ঝুম্‌কো চুলে ঝুম্‌কো ফিতে
আঁকাবাঁকা খাসা সিঁতে
সেই সিঁতিতে ঝিনুক ফুলের
মুক্তো যেন উঠছে হাসি।
আহা কচি নরম গালে
প্রজাপতি তালে তালে
চুম্ এঁকে দেয় ক্ষণে ক্ষণে
ফুলটুসিরে ফুলটুসি !

ওড়ে খুকুর মন

প্রণবকান্তি দাশগুপ্ত

দূর দূর দূর—অনেক দূর…
পেরিয়ে নদী সমুদ্দুর…
মিষ্টি রোদে, পাহাড় শেষে,
নীল আকাশে—চাঁদের দেশে,
হলুদ পাখি ওড়েরে ভাই—
ওড়ে সোনার ধন,
তার সঙ্গে আর কে ওড়ে ?
ওড়ে খুকুর মন !

হলদিয়া ভ্রমণ

অদিতি মৌলিক (গ্রাহক নং ২০৭৪৬)

প্রতি বছর স্কুল থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীর মেয়েরা বৃত্তি পেয়ে আসছে। সেই উপলক্ষে স্কুল থেকে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর মেয়েদের বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়। উদ্দেশ্য অত্যন্ত মহৎ। ভ্রমণ ও আনন্দ উভয়ই এক সঙ্গে উপভোগ করা যায়। আমি একজন সাধারণ মেয়ে। আমিও ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়েছি কিন্তু বৃত্তিলাভ করার সৌভাগ্য হয়নি। তাই বলে প্রতি বছর ভ্রমণের সুযোগ আমি হাতছাড়া করিনি।

ভ্রমণের মাধ্যমে শিক্ষালাভ হয় ও লোকচরিত্র জানা যায়। ভ্রমণ মানুষের সঙ্কীর্ণতা দূর করে —উদারতা বৃদ্ধি করে। আমরা যদি ছেলেবেলা থেকে ভ্রমণে পটু না হই, তা হলে ভবিষ্যতে 'কূয়োর ব্যাঙের' অবস্থা হবে।

যেদিন শুনলাম স্কুল থেকে আমাদের ১৫ই জুলাই তমলুকের হলদিয়া বন্দরে নিয়ে যাওয়া হবে সেদিন মনটা আনন্দে নেচে উঠল। আমার মধ্যে একটা ভ্রমণের নেশা আছে। ভূগোল পড়তে পড়তে আমার মন আমাদের দেশের ভৌগোলিক সীমা পার হয়ে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়। ভ্রমণ সম্পর্কে আমার মনের অবস্থা অনেকটা রবীন্দ্রনাথের 'দূরন্ত আশা' কবিতার মত—

"থাকিতে নারি ক্ষুদ্র কোণে আম্রবন-ছায়ে
সুপ্ত হয়ে, লুপ্ত হয়ে, গুপ্ত গৃহবাসে।"

গত ১৫ই জুলাই স্কুল থেকে আমরা বাসে করে হলদিয়া বন্দর দেখার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। হলদিয়া যেতে হলে তমলুকের ওপর দিয়ে যেতে হয়। তমলুক থেকে হলদিয়া বন্দর প্রায় মাইল

পনের। বেলা দশটার সময় রওনা হয়েছিলাম এবং প্রায় বারোটার সময় তমলুকে গিয়ে পৌঁছলাম। 'সান্ত্বনাময়ী গার্লস স্কুলের' মেয়েদের হোস্টেলে হাত-মুখ ধুয়ে মধ্যাহ্নের আহার শেষ করলাম। তারপর আবার বাসে উঠলাম। কিছুক্ষণ পরে হলদিয়াতে পৌঁছলাম। আগেই বলেছি যে হলদিয়া তমলুক মহকুমাতে অবস্থিত।

হলদিয়া! এই সেই হলদিয়া—যার জন্য আমরা মেদিনীপুর শহর থেকে ছুটে এসেছি! হলদিয়া বন্দর তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে। এখানে দেশ-বিদেশের মালামাল নিয়ে জাহাজ এসে ভিড়বে। এই হলদিয়াতে তৈল-শোধনাগার নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দুইটি ফরাসী সংস্থা ও একটি রুমানিয়া সংস্থার সঙ্গে কথাবার্তা প্রায় পাকা হয়ে গেছে। এই সংবাদ গত ২৯শে জুলাই তারিখের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র যৎকিঞ্চিতে উল্লেখ করা হয়েছে। হলদিয়াতে তৈল-শোধনাগার নির্মাণের পর সার-কারখানা নির্মাণের পরিকল্পনাও সরকারের আছে।

সমুদ্রে একটা জাহাজ ভেসে যেতে দেখলাম। চারিদিক ঘুরে দেখলাম সুন্দর দৃশ্য। প্রচণ্ড বাতাসে আমাদের মাথার চুলগুলি এলোমেলো হচ্ছিল।

হলদিয়ায় একটা বিরাট বন্দর তৈরী হচ্ছে। এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। ভবিষ্যতে এটি ভারতবর্ষের একটি শ্রেষ্ঠ বন্দর হবে। সে বন্দর তৈরীর মুখেই বন্দরের শোভা আমরা দেখলাম, এটাই তো আমাদের লাভ। আবার এই বন্দর দেখা হবে কিনা জানি না। এই যে দেখে এলাম এ দেখার স্মৃতি চিরকাল মনে থাকবে।

তমলুক একটা প্রাচীন স্থান। পূর্ব যুগে এর নাম ছিল তাম্রলিপ্ত। এক সময়ে তাম্রলিপ্তে তাম্রধ্বজ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি মহাভারতের যুগে পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব ধরেছিলেন। হলদিয়া যাবার সময় আমরা তমলুকের অপূর্ব শোভা দু'চোখ মেলে দেখে নিয়েছি। শুধু আপশোষ রয়ে গেল ৫২ পীঠের এক পীঠ বর্গভীমার মন্দির দেখতে পেলাম না বলে। যাই হোক ঘরের কাছে তমলুক। একদিন গেলেই হবে। হলদিয়া বন্দর নির্মাণের কাজ শেষ হলে আবার যাবার ইচ্ছা আছে।

বাসে চড়ে আমরা ফিরে এলাম। মেদিনীপুরে যখন ফিরে এলাম তখন রাত প্রায় দশটা।

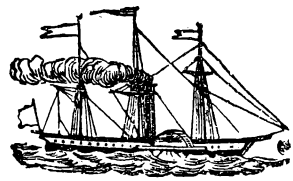

হেমন্ত

বিভূতিভূষণ আদক (গ্রাঃ নং ১৩৮৩৫)

হিমের পরশ হাওয়ায় নিয়ে এলো হেমন্ত,
ঘুমপাড়ানী গানে যেন ভুবন ঘুমন্ত।
সাত-সকালে সুয্যি ঠাকুর আর ওঠে না পুবে,
শীতের ভয়েই রয় বুঝি বা লেপের তলায় ডুবে।
কুয়াশাতে আব্‌ছা আকাশ মাঠ-নদী-ঘাট-বন,
টাপুর-টুপুর নিশির শিশির ঝরছে সারাক্ষণ।
উত্তরী-বায়-কণ্ঠে এবার শুরু ঝরার গান,
বুক দুর্‌-দুর্‌ তাই তো কাঁপে সবুজ পাতার প্রাণ।
চরজাগা ঐ শীর্ণ নদী ধাণাসিঁড়িটির তীরে,
কার যেন কোন কান্না নিয়ে বাতাস বহে ধীরে।
হেমন্তিকার গালচে পাতা হেমবরণী মাঠে
আলসে দুপুর মিষ্টি রোদে জাবর যেন কাটে।
আর দেরী নয়, আর দেরী নয়, আসছে এবার শীত,
শীর্ণ শাখে পাখ-পাখালীর স্তব্ধ প্রাণের গীত।
হেমন্ত গো, হিমের ঋতু, হিরণ তোমার বেশ,
নবান্নেরি গানটি গেয়ে ভরাও সোনার দেশ।

ডাঃ বি. দে

ফরদাপুরের শিউচন্দর, দিন নেই রাত নেই, সুর সেধেই চলেছে। তেমন উঁচুদরের ওস্তাদ গুরুর দেখা এখনও মেলে নি—তাই মনের দুঃখে আছে। সুর-সাধনার দাপটে, পাড়া-প্রতিবেশী —মায় গ্রামশুদ্ধ লোকজন অতিষ্ঠ নয়, অস্থির হয়ে উঠল। সব জিনিসেরই সহ্যের একটা সীমা আছে। সকলে পরামর্শ করে শিউচন্দরকে বললে, "এখানে ত যথেষ্ট তালিম দিলে, এতে কি আর মন ভরে? দেশ-বিদেশে ঘুরে বড় বড় চাঁইদের কাছ থেকে ভাল তালিম নাও, তারপর রাজবাড়িতে গিয়ে এলেম দেখিয়ে খেতাব নাওগে—রাজদরবারে কায়েম হয়ে বসো গে; নাম হবে রাজার গায়েন। এই ছোট্ট গাঁয়ে আর কতদিন পড়ে থাকবে? আর এখানে তোমার মত এমন গুণীর অদর ত কেউ বুঝবেও না।"

শিউচন্দর ভেবে দেখলে যুক্তিটা মন্দ নয়। লোটা-কম্বল আর বগলে তানপুরা নিয়ে সে গুরুজীর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল। নানা জায়গা ঘুরে, অবশেষে মহাওস্তাদ দ্রুম্ মারতন্ড্জীর ডেরায় গিয়ে পৌঁছাল। দেশ-বিদেশ থেকে অ-নে-ক সাকরেদ শিখতে এসেছে। লঙ্গরখানাতে খায়

আর একটা বড় ডেরায় সবাই রেওয়াজ করে। ভোর হতে না হতে সে রেওয়াজ শুরু হয় আর দুপুরবেলা ঘণ্টা তিনেক বন্ধ থাকে, তারপর আবার মাঝ-রাত্তির পর্যন্ত চলে। উদয়াস্ত সেই উদারা, মুদারা, তারার ওঠা-নামার চোটে, সুর সপ্তকের ধাক্কায়—দু' ক্রোশের মধ্যে ঘন বসতি নেই। বেশীর ভাগ লোক পালিয়েছে। এই সঙ্গীত-সাধনার স্কুলের নাম মহাদিত্য আশ্রম—কুলোকে বলে মহাদৈত্যাশ্রম। ওস্তাদজী ভোর হতেই হাত-মুখ ধুয়ে হাট-বাজার করতে চেলাদেরে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন; তারপর চানটান সেরে পুজা-আহ্নিক করেন—এই কাজ না করে কোন খাদ্যদ্রব্যই ছোঁন না তিনি। তারপর রক্তচন্দনের কৌটা কেটে, বেশ কষে এক লোটা চা-দুধ পান করে পান মুখে দিয়ে হেড সাকরেদ দানেশ্বরকে ডাক দেন। মেজাজ ভাল থাকলে ডাকেন—'আরে এ দানেশোয়া', রাগ করলে ডাকেন—'দেনেশোয়া'।

সে এলে তার কাছ থেকে সাকরেদরা কে কত প্রণামী দিয়েছে ওস্তাদজি সে সব খবর নেন। তারপর আশ্রমে যেয়ে তালিম দেন। তখন থাকেন বেশ হাসি-হাসি মুখ কিন্তু পেটে মতলবের কুণ্ডলী পাক দেয়, মাথায় কুচক্রের ফন্দী আঁটেন। সবাইকে সমান শেখান না। যেমন যেমন দক্ষিণা আর খোসামুদী মিলে, তেমন তেমন শেখানো চলে।

এ হেন আশ্রমে শিউচন্দর এসে বর্তে গেল। ওস্তাদজী নূতন সাকরেদ পেয়ে আহ্লাদে যেন আটখানা হয়ে পড়লেন। দানেশ্বরকে ডেকে বললেন, "বাচ্চুর থাকবার সব ঠিক করে দাও।"

দানেশ্বর একটা আস্ত ঘুঘু, সব ঠিকঠাক করে দিয়ে "কিছু খরচ কর" বলে বেচারার কাছ থেকে পেন্নামী আদায় করে নিলে।

দিন যায়, শিউচন্দরকে মাঝে মাঝে ওস্তাদজী খুব তারিফ করেন; বলেন—"বেটা রেওয়াজ তৈরি বড়ি আচ্ছি হ্যায়—আভি তাম্বাকু চড়াও।" খুব আদর-আদর ভাব।

রেওয়াজ চলে—সুর সপ্তক, ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী সব শেখা হয়ে গেল। এবার শিউচন্দর ওস্তাদজীর পায়ে গড় করে বললে—"এবার আমায় ওস্তাদ নামটা দিয়ে দিন।"

গুরুদেব একটা আসর বসিয়ে ঘটা করে আশীর্বাদ দিয়ে রায়ঃ দিলেন, "আজ থেকে শিউচন্দর ওস্তাদ।" তারপর তাকে রাজবাড়িতে যেয়ে সঙ্গত করে, এলেম দেখিয়ে, রাজার গায়েন হতে রওয়ানা হবার আদেশ দিলেন। সঙ্গে একটি বায়েনও যেতে চাইল, তাকেও নিয়ে যেতে অনুমতি দিলেন।

গুরুর পায়ে প্রণাম করে গায়েন আর বায়েন, লোটা-কম্বল, তানপুরা আর পাখোয়াজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কয়েকদিন পর দেশের রাজার বাড়ির সিংহ-দরজার পাশে যেয়ে আস্তানা গাড়ল। সিংহ-দরজা পার হয়ে রাজসভায় যাওয়া সহজ নয়। তার দু'দিকে সেপাই-সান্ত্রী গিজগিজ করছে। তাই শিউচন্দর ওস্তাদ রাত্রিবেলায় বড় বড় রাগ-রাগিণী ভাঁজতে শুরু করলে। বেশ রাত হলে একখানা যুৎসই দরবারী কানেড়া গাইতে লাগল। তখন রাজামশায় পালঙ্কে শুয়ে গড়গড়াতে

তামাক খাচ্ছিলেন, উঠে বসে প্রতিহারীকে তলব করলেন। প্রতিহারী আসতেই বললেন—"যে গাইছে তাকে এক্ষুণি নিয়ে এসে মেহমানখানায় থাকতে দাও, আর মন্ত্রী মশায়কে বলবে, কাল এই গায়েনকে যেন রাজদরবারে হাজির করা হয়।"

প্রতিহারী সাতবার কুর্নিশ করে "যে আজ্ঞা" বলে বিদায় নিলে। বায়েন আর গায়েনের থাকার খু—ব ভাল ব্যবস্থা হয়ে গেল, তা না বললেও বুঝতেই পারছ। শুয়ে শুয়ে বায়েন অনেক ভেবে চিন্তে বললে—"কি মোক্ষম গানই না গেয়েছ ওস্তাদ, কি কানাড়া গাইলে—কি যেন অভাগী না ঘরবাড়ী—"

গায়েন ধমক দিয়ে বললে—"আরে গানডুস্, কি না শিখেছ—অভাগী নয় রে বুরবক আভোগী, ঘরবাড়ী নয় দরবারী—চুপ করে শুয়ে পড়।"

পরের দিন গায়েন-বায়েনের রাজদরবারে তলব হল। বিরাট দরবার, মহারাজ গোঁফে তা দিচ্ছেন, মন্ত্রীর সঙ্গে শলা-পরামর্শ করছেন,—শেষে মন্ত্রী গান-বাজনার আসর চালু করতে বললেন। প্রথমে রাজবাড়ির গায়েনদের নানা রকমের সঙ্গীতের কসরৎ হল, তারপর নূতন গায়েন তানপুরা আর বায়েন পাখোয়াজ নিয়ে গান শুরু করলে। লোকে, সমঝদারে রাজদরবার একেবারে গিজ গিজ করছে।

গায়েন প্রথমেই সুর সপ্তক বেশ করে ভাঁজল, তারপর শুরু করলে—

জান্ দিয়ে যে রাখব মান—
গাইব সুরের সেরা তান—

প্রথম দু'লাইনের কসরৎ চলল—তারপর শুধু 'জান্ দিয়ে'—তারপর কেবলই ঘুরে ফিরে উদারা, মুদারা, তারাতে 'জান্' ঘুরতে থাকল।

পরে জা—আ—আ—আ—ন্
জা—আ আ—আ আ আ—ন্ ন্।

সবশেষে শুধু জান্—জান্—জ্যান্ জ্যান্ জ্যাং জ্যাং——জ্যাং—জ্যাং।

ভরা দুপুর, রোদ খাঁ-খাঁ করছে—এমনই ভয়াবহ 'জ্যাং জ্যাং' শুরু হল যে সব ছুটে পালাতে থাকল। মহারাজ কানে আঙুল গুঁজে টলতে টলতে অন্দর-মহলে গেলেন। রাজদরবারে লোক আর নেই। পাত্র-মিত্র যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। হাতিশালের হাতি, গোয়ালের গরু-মোষ, ঘোড়াশালে ইয়া তেজি ঘোড়া সব ছুট্ ছুট্। ঘর-দরজা ভেঙ্গে, পায়ের বেড়ী ভেঙ্গে কয়েদী পালাল। বাড়ি-ঘরের আনাচে কানাচে যে সব নেংটি ইদুর, আরশোলা ছিল—তারাও তিড়মিড় করে ছুটল। যজ্ঞশালের যজ্ঞ পণ্ড। কয়েকটা ছোট আরশোলা আর নেংটি ইঁদুর ত গুরুদেবের জটা-দাড়ি ভেদ করেই সুড়ুৎ করে চলে গেল। হুলস্থুল কাণ্ড! গুরুদেব থ বনে গেছেন—এ কী হল? গুরুদেবের রক্ত অভিশাপের ছোঁয়া লেগে গেল—পুরাকালের মুনিদের বংশধর ত। চট্ করে রেগে গেলেন,

আর এঁরা রেগে গেলে যা হয়—দরবারে যেয়ে 'জ্যাং জ্যাং' গায়েনকে দেখতে পেয়েই জটা ছিঁড়ে অভিশাপের মন্তর পড়ে গায়েনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে হুঙ্কার দিয়ে বললেন—"যা রে পাষণ্ড, জ্যাং জ্যাং করতে করতে পোকা হয়ে উড়ে যা'—জন্ম জন্ম ঐ করতে থাক। তুই আমার যাগযজ্ঞ সব পণ্ড করেছিস্।"

যেমনই বলা অমনি গায়েন চুপসে গিয়ে পোকা হয়ে 'জ্যাং জ্যাং' করতে করতে উড়ে গেল। বারেন মূর্ছা গেল হা হা করতে করতে। গায়েনের কপালে এই-ই লেখা ছিল, খণ্ডাবে কে ?

এক প্রকার পোকা পাহাড়ে জঙ্গলে থাকে, উদয়াস্ত খরার দিনে এই জ্যাং জ্যাং আওয়াজ করতে থাকে। লোকে বলে "আরো খরা হবে। হবেই ত রৌদ্র রসের জ্যাং ত।"

শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলায় এই পোকাকে 'রাজার গাইন' বলে অর্থাৎ কিনা রাজার গায়েন।

[শ্রীহট্টের রূপকথা]

শীতের কাপড় দে

শ্রীরঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

শীত এসেছে, আঃ কী শীত !
হাঁকছে ঃ খেঁজুর রস।
খোকন, রীনা কাঁপিস্ কেন
একটু রোদে ব'স ॥
শিশির-ঝরা রূপোর ভোরে
মুক্তো দোলে ঘাসের 'পরে,
মঞ্জু, রীতা, সঞ্জু, রাজু,
সবাই তোরা আয়।
সজনে ফুলে ভরলো তলা,
কুড়োবি সব আয় ॥

সীম, আলুতে সরষে বাটা
করবে মা ঠিক ভালো !
কাঁপছে কেরে ঐ কোণেতে ?
ছাখ্না জ্বেলে আলো ?
শীতের রাতে কাঁপছে ওরা,
আয়-না ছুটে সবাই তোরা,
গরীব ওরা ওদের কাছে
সবাই টেনে নে।
সাধ্য আছে যার যেটুকু
শীতের কাপড় দে ॥

তামাক খাচ্ছিলেন, উঠে বসে প্রতিহারীকে তলব করলেন। প্রতিহারী আসতেই বললেন—"যে গাইছে তাকে এক্ষুণি নিয়ে এসে মেহমানখানায় থাকতে দাও, আর মন্ত্রী মশায়কে বলবে, কাল এই গায়েনকে যেন রাজদরবারে হাজির করা হয়।"

প্রতিহারী সাতবার কুর্নিশ করে "যে আজ্ঞা" বলে বিদায় নিলে। বায়েন আর গায়েনের থাকার খু—ব ভাল ব্যবস্থা হয়ে গেল, তা না বললেও বুঝতেই পারছ। শুয়ে শুয়ে বায়েন অনেক ভেবে চিন্তে বললে—"কি মোক্ষম গানই না গেয়েছ ওস্তাদ, কি কানাড়া গাইলে—কি যেন অভাগী না ঘরবাড়ী—"

গায়েন ধমক দিয়ে বললে—"আরে গানডুস্, কি না শিখেছ—অভাগী নয় রে বুরবক আভোগী, ঘরবাড়ী নয় দররারী—চুপ করে শুয়ে পড়।"

পরের দিন গায়েন-বায়েনের রাজদরবারে তলব হল। বিরাট দরবার, মহারাজ গোঁফে তা দিচ্ছেন, মন্ত্রীর সঙ্গে শলা-পরামর্শ করছেন,—শেষে মন্ত্রী গান-বাজনার আসর চালু করতে বললেন। প্রথমে রাজবাড়ির গায়েনদের নানা রকমের সঙ্গীতের কসরৎ হল, তারপর নূতন গায়েন তানপুরা আর বায়েন পাখোয়াজ নিয়ে গান শুরু করলে। লোকে, সমঝদারে রাজদরবার একেবারে গিজ গিজ করছে।

গায়েন প্রথমেই সুর সপ্তক বেশ করে ভাঁজল, তারপর শুরু করলে—

জান্ দিয়ে যে রাখব মান—
গাইব সুরের সেরা তান—

প্রথম দু'লাইনের কসরৎ চলল—তারপর শুধু 'জান্ দিয়ে'—তারপর কেবলই ঘুরে ফিরে উদারা, মুদারা, তারাতে 'জান্' ঘুরতে থাকল।

পরে জা—আ—আ—আ—ন্
জা—আ আ—আ আ আ—ন্ ন্।

সবশেষে শুধু জান্—জান্—জ্যান্ জ্যান্ জ্যাং জ্যাং——জ্যাং—জ্যাং।

ভরা দুপুর, রোদ খাঁ-খাঁ করছে—এমনই ভয়াবহ 'জ্যাং জ্যাং' শুরু হল যে সব ছুটে পালাতে থাকল। মহারাজ কানে আঙুল গুঁজে টলতে টলতে অন্দর-মহলে গেলেন। রাজদরবারে লোক আর নেই। পাত্র-মিত্র যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। হাতিশালের হাতি, গোয়ালের গরু-মোষ, ঘোড়াশালে ইয়া তেজি ঘোড়া সব ছুট্ ছুট্। ঘর-দরজা ভেঙ্গে, পায়ের বেড়ী ভেঙ্গে কয়েদী পালাল। বাড়ি-ঘরের আনাচে কানাচে যে সব নেংটি ইঁদুর, আরশোলা ছিল—তারাও তিড়মিড় করে ছুটল। যজ্ঞশালের যজ্ঞ পণ্ড। কয়েকটা ছোট আরশোলা আর নেংটি ইঁদুর ত গুরুদেবের জটা-দাড়ি ভেদ করেই সুড়ুৎ করে চলে গেল। হুলস্থুল কাণ্ড! গুরুদেব খ বনে গেছেন—এ কী হল? গুরুদেবের রক্তে অভিশাপের ছোঁয়া লেগে গেল—পুরাকালের মুনিদের বংশধর ত। চট্ করে রেগে গেলেন,

যে পথে যেখানে গেছি

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

—এক—

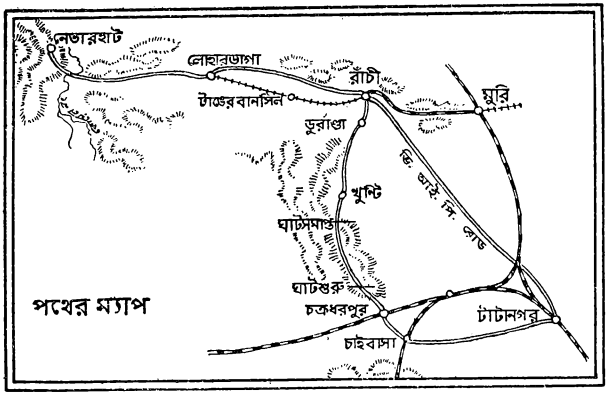

পুজোর দিন কতক আগে একদিন আমাদের পল্লীর ডাক্তার সেনগুপ্ত আমায় বললেন, 'নেতায় হাট যাবেন ?'

জিগ্যেস করলাম, 'সে আবার কোথায় ? ও! সেই বীরভূমে নেতা ধোপানীর ঘাট ? যেখানে— ?'

তিনি সহাস্যে বললেন, 'না—না—রাঁচীর বিরানব্বই মাইল দূরে একটা পাহাড়ে—'

বললাম, 'যেমন গো-হাট, গড়িয়াহাট সেখানে কি তেমনি নেতাদের হাট বসে ?'

'আরে না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য—সূর্যোদয় দেখবার মতো, যেমন দার্জিলিং জেলায় টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখতে অনেকে যায় তেমনি ওখানেও সূর্যোদয় দেখতে বহু লোক গিয়ে থাকে। যাবেন কিনা বলুন না ?'

বললাম, 'দেখুন ডাক্তারবাবু, সেবার কাশ্মীর যাবার প্ল্যান করেছিলাম। সঙ্গীও জুটেছিল জন কতক। শেষে কাটতে কাটতে বাকি রয়ে যায় মাত্র দুজন—আপনি আর আমি। শেষে আপনারও সর্দি হয়—বাকি থাকি কেবল আমি। অর্থাৎ ওয়াগনগুলো কাটতে কাটতে বাকি থাকে কেবল ইনজিনখানি। আমাকেই অর্থাৎ অবশেষে ইনজিনকেই উদ্‌ভ্রান্তের মতো একটা পথ ধরে ছুটতে হয়েছিল। এবার আমারও ইচ্ছে-সর্দি হতে পারে।

ইতিমধ্যে দত্ত সিগারেট টানতে টানতে আফিস ফেরৎ এসে জুটেছিল ; জিগ্যেস করলে, 'ইচ্ছে-সর্দি আবার কি ? যেমন ইচ্ছে-বসন্ত, এও কি তেমনি ?'

বললাম, 'যেমন পড়তে ইচ্ছে না থাকলে পেট ব্যথা করে, মাথা ধরে, এও তেমনি যাবার ইচ্ছে না থাকলে হঠাৎ নাক বন্ধ, হাঁচির পর হাঁচি, চোখ দিয়ে জল পড়ে, কানে তালা ধরে, গা ম্যাজ-ম্যাজ করে, শুয়ে পড়তে—'

দত্তর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, মানে ঊনপঞ্চাশ ; একটু ফক্কোড়গোছের ; বললে, 'কি ডাক্তারবাবু, এ ধরনের কোন সর্দি-রোগ হয় নাকি ?' সে জানতো আমাদের কাশ্মীর-যাত্রা-কাহিনী। কারণ সেও একখানি কেটে পড়া ওয়াগন ছিল।

ডাক্তারবাবু গম্ভীরমুখে বললেন, 'উনিই জানেন।'

বুঝলাম, লেগপুলিংটা বেশি হয়ে গেছে। ডাক্তার মানুষ! আমার প্রাণটা যে ওঁরই হাতে!

তার উপর আমার বয়স হয়েছে। সামলে নিলাম। সপ্তাহে চারশ' গ্রাম চাল খেয়েও যে ক'টা দিন বেঁচে থাকা যায়!

এমন সময়ে এলো রণজিৎ—ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সের প্রগতিশীল তরুণ। ছিপছিপে, ফুটফুটে, চোখে চশমা, মণিবন্ধে সোনার ঘড়ি, আঙুলে জ্বলন্ত সিগারেট, গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি, পায়ে মখমলি স্যানডাল। এসেই বললে, 'কি কথা হচ্ছে?'

দত্ত বললে, 'নেতার হাট বেড়াতে যাবার কথা।'

'কবে? কে কে যাচ্ছে?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'পুজোর মধ্যে বা পরে। সঙ্গী খুঁজছি। যাবে?'

'যেতাম। কিন্তু আমার অফিস না থাকলে—। নেতার হাট শুনেছি, মানে বিদেশী টুরিস্টদের মন্তব্য কাগজে পড়েছি—কাশ্মীরের চেয়েও সুন্দর। ওটা নাকি ভারতের সুইৎজারল্যানড।'

দত্ত বললে, 'রুণু, তোমার কাছে সুইৎজারল্যানড, লাপল্যানড, জুলুল্যানড, হেলিগোল্যানড, ইংল্যানড, নাগাল্যানড আর গোয়াল্যান্দ সবই সমান। কারণ, তুমি না দেখেছো পাহাড়, না দেখেছো অরণ্য, না দেখেছো সমুদ্র। বিদেশী টুরিস্টদের মন্তব্যে তোমার কি এসে যায়?'

রণজিৎ বাবা-মার বড় আদুরে ছেলে—যদিও তার পরে কয়েকটা ভাই-বোন এবং তার নিজেরও দুটি পুত্র আছে। তবু এ যাবৎ মায়ের কোল ছাড়া হয় নি। তার বিশ্বের ভৌগোলিক জ্ঞান ভূগোল-গ্রন্থ ও মানচিত্রলব্ধ। দত্তর খোঁচায় উত্তেজিত হয়ে বললে, 'হোয়াট ডু ইউ মীন? মানে কী বলতে চান? আমি কি যেতে পারি না?'

দত্ত বললে, 'পারো, কিন্তু যাবে না।'

'হোয়াই? মানে কেন?'

'তোমার বাবা-মা, তোমার আফিস—সবাই তোমায় ভালবাসে। কেউ ছাড়বে না।'

'দিস্ ইজ্ টু মাচ্। মানে হচ্ছে, বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন। আচ্ছা, দেখা যাক শেষ অবধি কে কে যায়। ডক্টর, কাল আমি ফাইনাল কথা দেবো।' বলে সিগারেটে জোর টান দিলে।

দত্ত বললে, 'আমি যদি অফিসে ম্যানেজ করতে পারি কথা দিচ্ছি যাবো।'

রণজিৎ বললে, 'সাহেব ছাড়বে তো? আপনাকে না দেখলে শুনেছি আপনার সাহেবের মাথা খারাপ হয়ে যায়।'

'আমার সাহেবের মাথায় তো পাগড়ি নেই—।'

'জানেন আমার সাহেব ব্রিটিশ—?'

'আমার সাহেব খাঁটি ইস্ট বেংগলিস—'

সেদিন ঐ পর্যন্ত! পরদিন সন্ধ্যায় এসে রণজিৎ কথা দিলে, যাবে। তবে লক্ষ্মীপুজোর আগের দিন সোমবার সকালে ফিরতে হবে। না ফিরলে—

আমার তবু বিশ্বাস হলো না। সে চলে গেলে ডাক্তার সেনগুপ্ত আমায় বললেন, 'কেউ যদি না যায়, আপনি আর আমি যাবোই—।'

বললাম, 'আমার সাহেবও নেই, বাবা-মাও নেই। এদিকে বাহাত্তুরে ধরতেও আর বাকি কি? কিন্তু পুজোর পর একাদশীর দিন রওনা হওয়াই তো ভাল। দত্ত যাবে কি?'

'যাবার খুবই ইচ্ছে। দেখা যাক—'

সেদিনও কথা আর এগোলো না। কেবল সঙ্গে কি কি নিতে হবে তার আলোচনা হলো। কারণ, খবর পেয়েছিলাম, রাঁচির ওধারে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। সেখান থেকে বিরানব্বই মাইল দূরে প্রায় চার হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের মাথায় তো আরও ঠাণ্ডা হবার কথা। তারপর বিহারে দুর্ভিক্ষ। খেতে পাবো কিনা তাই বা কে জানে? ওরা আমাদেরই ধরে খেয়ে ফেলে যদি? আমরা তো বাংলাদেশে দিব্যি পেট ভরে খেয়ে আছি। খোলা বাজারে চালের কেজি চার টাকার মতো। কোথাও কোথাও তারও বেশি। রেশানে সপ্তাহে মাথাপিছু চারশ' গ্রামের ব্যবস্থা এ কি কম কৃতিত্ব? ছেলেবেলায় মুষ্টিভিক্ষা করে আর্তের সেবা করার কথা মনে পড়ে। চাল না পেলে আপেল, বীট, কাঁচকলা খেতে তো বাধা নেই! তারও উপদেশ শোনা যায়। সত্যি তো। টাকা ফেললে কী না পাওয়া যায়? বাংলাদেশের হাওয়ায় টাকা উড়ছে। কেবল ধরে পকেটে পুরতে যেটুকু দেরি। তাই কোলকাতায় এলে গোটা ভারতের লোক, কেবল তাই নয়, গোটা পৃথিবীর লোক দেখা যায়। আজকাল আবার হিপির দলও জিপসির মতো আসতে শুরু করেছে, কেবল ওরা কোথাও ছাউনি ফেলছে না! ঘরে ঘরে গান শোনা যায়, 'হিপি হিপি—'

সকলেই জানে, এবারকার পুজোর ষষ্ঠী-সপ্তমীর দিন দুটি বৃষ্টি ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। বৃষ্টির ধরন দেখে মনে হয়েছিল, অষ্টমীও ভেসে যাবে। মাত্র নবমীর সকাল থেকে শরতের সোনার রোদ ছড়িয়ে পড়বে; আবার সন্ধ্যার পর থেকেই মনের কোণে বিসর্জনের করুণ সুর বেজে উঠবে। তবু ভিজে সপ্তমীর দিনই স্থির হলো আমরা চারজনে, ডাক্তার সেনগুপ্ত, দত্ত, রণজিৎ ও আমি পরদিন রাউরকিলা একসপ্রেসে টাটানগর রওনা হচ্ছি, যদি আকাশ পরিষ্কার হয়। দত্ত অফিসে ম্যানেজ করেছে, রণজিতের বাবা-মা শ্রীমানকে ডাক্তারবাবুর হাতে সঁপে দিয়েছেন, ডাক্তারবাবুর বাড়িতে কী হয়েছে তিনি বললেন না; আর আমার বাড়িতে—'গেলেই ভাল'।

সৌভাগ্যবশতঃ অষ্টমী এলো জলহীন মেঘের কেতন উড়িয়ে সোনার রথে চড়ে। ভিজে শিউলী শাখায়, ঘাসে, গাছপালায়, শাপলাবনে ঝলমল, ঝিলিমিলি, টলটল রূপ। আমরাও তৈরি হতে লাগলাম এবং সন্ধ্যার কিছু পরে ঢাক-ঢোল-কাঁসির খুশির বোল কানে নিয়ে চারজনে যাত্রা করলাম। দলটি হলো চমৎকার—বয়সে মিল নেই, বৃত্তিতেও পার্থক্য, দেহেও শক্তির যথেষ্ট তারতম্য, কিন্তু একটি জায়গায় ঐক্য—চারজনেই যাত্রী, গন্তব্য এক।

কিন্তু প্রথম বিপত্তি ঘটলো, ট্যাকসি-যান নিয়ে। চারজন যাত্রী, সঙ্গে সাতটি মাঝারি ধরনের

মোট। দমদম থেকে হাওড়া স্টেশনে ট্যাকসি ছাড়া পৌঁছবোই বা কিসে? পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছি। সমুখ দিয়ে ভরা ট্যাকসি ছুটে যায়, খালি ট্যাকসির ড্রাইভার ডাকলেও ফিরে তাকায় না। এদিকে রাত ক্রমে বাড়ছে। সময়মতো পৌঁছতে না পারলে গাড়িতে বসবার জায়গাটুকুও মিলবে না।

বললাম, 'চলুন, বাসে শ্যামবাজার পর্যন্ত গিয়ে ওখান থেকে ট্যাকসি ধরা যাবে।'

একখানি বাস থামানো হলো; কনডাকটার বললে, 'সওয়ারি নেবো, মালের জায়গা দিতে পারবো না' বলেই ঘণ্টা বাজালো। কিন্তু ঘণ্টা বাজালেই কি গাড়ি ছাড়তে পারে? জায়গাটা যে দমদম মানে দমাদ্দম। সঙ্গে 'চড়ানেওয়ালা' ছিলেন জন কতক, অমনি হাঁক উঠলো, 'এই! রোখো।'

বললাম, 'মালের ভাড়া দেবো। সামনে তুলে নাও।'

পুজোর বাজারে সকলেই দু'পয়সা লুঠতে বেরিয়েছে, কেবল আমরা যাচ্ছি ছড়াতে।

কনডাকটার বললে, 'মালের ভাড়া লাগবে দু'টাকা।'

'তাই দেবো।'

মালগুলো উঠলো, আমরাও উঠলাম মানে আমাদের ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো—জেনানা-মর্দানার সেই অবর্ণনীয় গাদাগাদির মধ্যে। তার মধ্যে পকেটমার, চোর, গুণ্ডা, সৎ, নিরীহ, বালক-বালিকা, শিশু-তরুণ-বৃদ্ধ মানে 'বিবিধের মাঝে এক মিলন মহান।' সমুখে ড্রাইভারের পাশে আমাদের মোট-ঘাট; তার পাশে এক দোনলাপরা উত্তমকুমার। তার চালচলনে সন্দেহ না হয়ে যায় না।

ডাক্তার সেনগুপ্ত, দত্ত ও রণজিৎ রড ধরে ঝুঁকে জাফরির ভেতর দিয়ে মালের দিকে শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আমি চারধারের চাপ সয়ে রড ধরে দাঁড়িয়ে আছি।

ঠিক ছিল কোথাও কুলি ভাড়া দেবো না। রেল-স্টেশনে কুলির খপ্পরে যারা পড়ে তারাই জানে তখন কী ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে! কিন্তু যতদূর জানি, এক ভীষ্ম ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ প্রতিজ্ঞা পালন করেন নি। আমরা ভীষ্মেরই দেশের লোক। অতএব প্রতিজ্ঞা যে পালিত হবেই এতে আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না।

শ্যামবাজারের মোড়ে বাস থেকে নেমেই ট্যাকসি ধরার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু চেষ্টা বৃথা হলো। এদিকে সময় বয়ে যাচ্ছে। রাস্তা যানবাহন ও জনাকীর্ণ—রুদ্ধ জলধারার মতো সেই স্রোত এক একবার থেমে থাকছে। তখন কোলাহল উঠছে, ধাক্কাধাক্কি হচ্ছে—সবাই পথ চায় জীবনের কোথাও থেমে থাকবার উপায় নেই—হয় চল, নয় পথ ছাড়, চলতে দাও।

বললাম, 'ট্যাকসি যখন পাওয়াই যাচ্ছে না, তখন সরকারি বাসে চাপা যাক।'

'কিন্তু এত মালপত্র?'

'ভাড়া দেবো। যেমন করে হোক হাওড়া স্টেশনে পৌঁছতেই হবে।'

'ঠিক—ঠিক—'

বললাম, 'চলো স্ট্যাণ্ডে—ওখানে খালি বাস পাওয়া যাবে।'

স্ট্যাণ্ডে পৌঁছে বাসে বমাল উঠতে যেতেই কনডাকটার ফটক আগলে দাঁড়িয়ে বললে, 'করছেন কি—করছেন কি? এত মাল নিয়ে—'

বললাম, 'ভাই, মালিক চড়বে অথচ তার মাল চড়বে না এ কি রকম কথা? দুইয়েরই ভাড়া দেবো।'

'তা তো দেবেনই। কিন্তু এতো মাল রাখবেন কোথায়? অন্য প্যাসেঞ্জারের অসুবিধে—'

মালগুলোকে 'খোকাখুকুর মতো কোলে-কাঁধে নিয়ে বসবো' বলতে বলতে চারজনে বমাল উঠে বাসের পশ্চাদ্‌ভাগ দখল করলাম। সেদিকে নিভৃতে বসেছিলেন, এক তরুণ দম্পতী।

তাঁদের বললাম, 'আপনাদের কোন অসুবিধে হলে বলবেন।'

তরুণটি বললেন, 'কিছুমাত্র নয়। এ বেশ ভালই হলো। এদিকে আর কেউ আসতে পারবে না।'

বুঝলাম, তাঁরা এইটেই চাইছিলেন।

তারপর বললেন, 'যাবেন কোথায়?'

'নেতার হাট।'

'ফাইন জায়গা। আমরা দেখে এসেছি। আবার যেতে ইচ্ছে করে। থাকবেন কোথায়? ঘর রিজার্ভ করেছেন?'

'না—'

'তা হলে বিপদে পড়বেন।'

'টুরিস্ট ব্যুরোর সাহায্য নেবো।'

'তবেই পেয়েছেন! ওরা একের নম্বর ফোর টোয়েন্‌টি! দালালের মতো কেবল কথা ছড়ায়। ওদের কাজই ঐ। গিয়েই দেখবেন, আমার কথা ঠিক কি না।'

চিন্তায় পড়লাম।

ইতিমধ্যে বাস পথ-বিপথ ঘুরে হাওড়ায় এলো। কনডাকটার আমাদের ভাড়া নিলে, মালের ভাড়া নিলে না। বাস থেকে নামতেই কুলি ছুটে এলো। ডাক্তারবাবু বললেন, 'লে চলো।'

অবাক হলাম। এমন তো কথা ছিল না। বুঝলাম, মানুষ প্রতিজ্ঞা করে ভাঙতে। হায়! চৌদ্দপুরুষের পিতামহ ভীষ্ম! শেষে সেই কুলির খপ্পরে? কুলি বললে, 'দো রূপেয়া বকশিশ।'

'বহুৎ আচ্ছা। ঠিকসে বইঠা দেও—'

'জী হুজুর।' এবং ঠিকমতো জায়গা করে দিলে টাটা কোচে। আর বকশিশ আদায় করে ছাড়লে, চার টাকা! ডাক্তারবাবু হাত কামড়াতে লাগলেন। কিন্তু আমরা বাংক-বেঞ্চি তো পেলাম! টাটাতে আমাদের কোচ কেটে রেখে চলে যাবে! ওঃ! মজার! আমরা তখন ঘুমিয়ে

থাকবো! ক্রমে দুটি-চারটি করে যাত্রী উঠতে লাগলো, যে যার মতো জায়গা জুড়ে বসতেও লাগলো। সবাই যাবে টাটানগর।

আমরা বসে বসে গল্প করছি, গাড়ি ছাড়তেও আর বেশি দেরি নেই এমন সময়ে উঠলো চারটি অল্পবয়সী মেম আর এক ছোকরা সাহেব। তারা একেবারে হোয়াইট সীতে ডুব দিয়ে সবে উঠে এসেছে। তাদের কারো চুল বাবুই বাসার মতো, কারো মাথার চুল কোঁকড়া কদম ফুল। তারা উঠেই বললে, 'দিস ইজ লেডিজ কম্পার্টমেণ্ট।' যেমন মেমেদের গলার সুর হয় তেমনি সুরে।

সাহেব-মেম দেখলে আমার বুক গুর-গুর করে, ইংরেজী শুনলে মাথা বাঁই-বাঁই করে ঘুরতে থাকে। ঢোক গিলে তাকাই আর ভাবি, 'এই খেয়েছে!'

রণজিতের কানে কানে দেশওয়ালি বুলিতে মানে বাংলায় বললাম, 'দেখ তো গাড়ির গায়ে লেডিজ কথাটা লেখা আছে কি না!'

খাঁটি মেমসাহেব দেখে সে বেচারিরও চোখ তখন ধেঁধে গেছে, বললে, 'কৈ দেখতে পাচ্ছি না তো।' বলেই তাদের দিকে পিট-পিট করে তাকাতে তাকাতে একটু সরে বসলো। তারপর আস্তে আস্তে বললে, 'ওরা আমাদের পাশে তো বসতে পারে।' কী স্পর্ধা!

ভাগ্যিস তারা বাংলা বোঝে না, বোঝে প্রথম ও দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা। তাদের কুলিরা বলতে লাগলো, 'চলিয়ে উধার। বহুৎ জাগা হ্যায়।'

তবু তারা নড়ে না, আমাদের দিকেও তাকায় না, খালি বলে, 'হি হ্যাজ গন টু কল দি গার্ড।' শেষে কি মনে হলো, অন্য গাড়িতে চলে গেল। যে গার্ডকে 'কল' দিতে গিয়েছিল সে বা গার্ড কেউই এলো না। একটা মস্ত ফাঁড়া কেটে গেল! নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি। তারপরই গাড়ি ছাড়তেই উঠে দরজার কাছে গিয়ে দেখি, তার মাথায় লেখা, লেভিজ! বুঝলাম রণজিতের আলো-আঁধারি লেগেছিল। বললাম, 'রণজিৎ, কোলকাতায় ফিরেই তোমার প্রথম কর্তব্য হবে চশমা পালটানো। অত বড় শব্দটা পড়তে পারলে না?'

রাত তখন দশটা। ডাক্তারবাবু বললেন, 'এখনই শোয়া ঠিক নয়। এক হাত খেলা যাক।' এবং আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আপনি আমার পার্টনার' এবং পকেট থেকে তাস বার করলেন।

বললাম, 'ওসব অনেককাল আগে চুকিয়ে দিয়েছি।' তথাপি নিস্তার নেই।

গাড়ি ছুটছে, খেলা চলছে, আমি নয়, ডাক্তারবাবু হারছেন। বাইরে আলো-অন্ধকার—গ্রাম-প্রান্তর, মাঝে মাঝে পুজোমণ্ডপ, আলোর মালা, এসেই সরে যাচ্ছে। অবশেষে রাত প্রায় একটায় শুয়ে পড়া গেল। কিন্তু ঘুমোয় কার সাধ্য? রণজিৎ ও দত্ত গল্প জুড়ে দিলে। অনেক দিন আগে একবার দিল্লি যাবার সময়ে আমাদের কামরায় দু'জন মাড়োয়ারি উঠেছিল। তারা সারারাত ধরে 'তেজি-মন্দা, তেজি মন্দা' করতে করতে কাউকে ঘুমোতে দেয় নি। আবার সেই বড়বাজারি বুলির মতো রাজ্যের গল্প আর 'হাহা, হিহি' হাসি ওদের মুখ দিয়ে বেরোতে লাগলো। শেষে রাত

চারটেয় গাড়ি টাটানগর পৌঁছে আমাদের কেটে দিয়ে হাওয়া হয়ে গেল। টিকটিকির লেজের আগার মতো দু'তিনখানা গাড়ি স্টেশন প্ল্যাটফরমে পড়ে রইলো। আমরা চারজন ছাড়া আমাদের গাড়ি থেকে সকলেই সেই শেষরাতে মোটঘাট নিয়ে নেমে চলে গেল।

—দুই—

একটু ফরসা হতে প্ল্যাটফরমে নামলাম। এই সেই টাটানগর। বেচারি ভোম্বোল সর্দার! তার ব্যর্থতার চোখের জল আজও আমার মনে পড়ে! সে এখন কোথায়, কি করছে, কে জানে! এখানে সে আসতে পারে নি, কিন্তু কপালগুণে তার লেখক এলো। আগে এর নাম ছিল, 'কালিমাটি'। তারপর হয়েছে টাটানগর, শহরের নাম জামসেদপুর। জামসেদজী টাটার মহা যজ্ঞভূমি—বিশাল, বিচিত্র, সুন্দর। তারপর চারজনে যে যার মোট হাতে ঝুলিয়ে চললাম, চায়ের দোকানে। চা খেয়ে চললাম দোতলায় প্রথম শ্রেণীর ওয়েটিং রুমে। সেখানে গিয়ে মালপত্র রেখে অন্তরে-বাইরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবার কাজে ব্যস্ত হলাম। চমৎকার ব্যবস্থা! সোফা, চেয়ার, টেবিল, আয়না, প্রিভি, শাওয়ার, ট্যাপ, বেসিন ইত্যাদি রয়েছে। এলো কীপার। বললাম, 'আমরা অনেক দূরের যাত্রী। এখনই চলে যাবো। বকশিশ দেবো।'

তারপর ক্ষৌর-কর্ম ও স্নানাদি সেরে, সঙ্গের আহার্য গলাধঃকরণ করে বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু কীপার বকশিশ নিতে এলো না। রণজিৎ ও দত্ত বললে, 'পয়সাটা টেবিলের ওপর রেখে দেওয়া যাক।'

বললাম, 'হাতে রাখুন। নামবার পথে দেখা হলে দেবেন।' কিন্তু কেউই নিলে না।

পথে বার হলাম। সামনে কালো মেঘের মতো দলমা পাহাড়—জানি না ডলামাইটের রূপান্তর কি না। অ্যাশফালট-বাঁধানো সুন্দর রাজপথ, দুপাশে পথতরুশ্রেণী, বাড়ি-ঘর। কিন্তু যাবো কোথায়? বেলা বারোটা-সাড়ে বারোটায় ট্যাকসি বা মোটর-বাসে রওনা হতে হবে রাঁচির পথে। রাঁচি থেকে লাইট-রেলওয়েতে যাবো লোহারডাগার দিকে। কিন্তু তখন সকাল সাড়ে সাতটা মাত্র।

সঙ্গীরা আমায় বললেন, 'আপনার ছোট বোন এখানে থাকেন শুনেছি। আপনি বরং তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসুন, আমরা এতক্ষণ—'

'শহরটা দেখে নিই। এই বলতে চান তো? সে হচ্ছে না। সকলেই সেখানে চলুন। তবে এই আক্রা-গণ্ডার দিনে আমরা তার বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করবো না। কেবল দেখা করেই চলে আসবো। কিন্তু তার বাড়িটা কোথায় তাই যে জানি না। তবে ঠিকানাটা জেনে এসেছি। চলুন।'

ট্যাকসি চেপে চললাম সেদিকে। ট্যাকসি ছুটছে। বায়স্কোপের মতো নূতন নূতন ছবির একটানা স্রোত চোখের সামনে দিয়ে অবিরাম সরে যেতে লাগলো।—রাজপথ, বাড়ি-ঘর, সুবিশাল কারখানা, ওভার ব্রিজ, যান-বাহন, পথিকজন। এই শিল্পনগরী আধুনিক ভারতের গৌরব। ঐ কারখানায় হাজার হাজার শ্রমিক দিন-রাত মানুষের প্রয়োজনীয় বিবিধ দ্রব্যসম্ভার গড়ছেন। সেগুলো

দূর দেশান্তরে, সমুদ্রপারেও রপ্তানি হচ্ছে। এখানে হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, খেলার মাঠ, গ্রন্থাগার, সিনেমা, বাজার অর্থাৎ আধুনিক সভ্যতার অঙ্গ কিছুরই অভাব নেই। এ সবেরই সমাবেশ হয়েছে যন্ত্রকে ভিত্তি করে। যন্ত্রেরও মূলে আছে অর্থার্জন-উদ্দেশ্য। আর অর্থ থেকে লাভ হয়, রাজনৈতিক ক্ষমতা। যাই হোক, আমরা এসে পড়লাম কদমা-পল্লীতে আমাদের গন্তব্যস্থলে। কিন্তু ঠিকানা মতো বাড়িখানি তো পাই না! রাস্তার মোড়ে ট্যাকসি-স্ট্যাণ্ডে মালপত্র নামিয়ে ট্যাকসি ছেড়ে দিলাম। কিন্তু কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি? এ যে সর্বভারতীয় বিহারী শহর! অবশেষে পর পর দু'জন বাঙালি ভদ্রলোককে ধরে জিজ্ঞাসা করে বাড়ির সন্ধান মিললো। আমরা বাড়িখানির কাছাকাছিই দাঁড়িয়েছিলাম। সেখান থেকে দেখাও যাচ্ছিল। কোলকাতায় যিনি আমাদের ঠিকানা দিয়েছিলেন, তিনি বাড়ির যা নম্বর তার সঙ্গে একশ' যোগ করেছিলেন। তাই এই বিপত্তি।

বলা বাহুল্য, সেখানেই আতিথ্য স্বীকার করতে বাধ্য হলাম। আমরা চার মুশাফির তাই কামনা করছিলাম। সেখানে প্রচুর জলযোগান্তে স্থলযোগের মধুর আশ্বাস নিয়ে মালপত্র রেখে শহরের কয়েকটি দ্রষ্টব্যস্থান দেখতে বার হলাম। আমাদের গাইড হলো শ্রীমান পিনটু—স্থানীয় কলেজের ছাত্র এবং আমার আত্মীয়।

আবার ট্যাকসি ধরা হলো। প্রথমেই গেলাম সাকচি-বাজার। সেখানে মফঃস্বলে যাবার বাস ও ট্যাকসি পাওয়া যায়। খিঞ্জি ও অপরিচ্ছন্ন অঞ্চলটি আমার একটুও ভাল লাগলো না। অনেক ঘোরাঘুরি, খবরদারি ও দরাদরি করেও না ঠিক হলো বাস, না হলো ট্যাকসি। অথচ আমাদের সেইদিনই বিকেল পাঁচটায় রাঁচি পৌঁছতেই হবে। কেবল কি তাই? আমরা চাই পুরনো পথ দিয়ে, চক্রধরপুর-ঘাট ও খুন্টির মধ্যকার পর্বতীয় পথে চলতে চলতে গভীর জঙ্গলের দৃশ্য দেখতে। এই অংশটির দীর্ঘতা বাইশ মাইল। আবার জামশেদপুর থেকে ঐ পথ দিয়ে রাঁচি যেতে গেলে একশ' বত্রিশ মাইল অতিক্রম করতে হয়। আর নতুন ভি. আই পি. (ন্যাশান্যাল হাই ওয়ে) রোড দিয়ে জামশেদপুর থেকে রাঁচির দূরত্ব মাত্র বাষট্টি মাইল। আমাদের ঈপ্সিত পথে সহজে কোন ট্যাকসি যেতে চাইলো না, যে রাজী হলো সেও চেয়ে বসলো, একশ' টাকা। কিন্তু আমরা ষাট টাকার বেশি ছাড়তে নারাজ।

অনেক রগড়ারগড়ি চললো। তবু লোকটি আমাদের কথায় রাজী হলো না, পঁচাত্তুরে এসে ঠেকে রইলো। কিন্তু আমাদের ঠিকানা লিখে নিলে, আর বললে, 'রাস্তামে দোসরা সওয়ারি চড়ায়ে গা। আরে বাবু, ঘাটপর গাড়িকো চারো টায়ার এইসা হো যায়েগা' বলে পাঁইয়াজী দাড়ি নাড়তে নাড়তে হাত দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে দেখালো।

নিরাশ হয়ে চলে এলাম। পিনটুকে বললাম, 'এবার কোথায় নিয়ে যাবে?'

পিনটু বললে, 'ডুমনা যাবেন যেখান থেকে এই শহরের জল আসে? দেখবার মতো জায়গা।'

শুনলাম, সেখান থেকে জায়গাটি অন্ততঃ ছ' মাইল। কিন্তু আমরা চাই বেলা দুটোর মধ্যে

অন্ততঃ ভি. আই. পি রোড দিয়েও বেরিয়ে পড়তে। তখন বেলা সাড়ে নটা। অগত্যা সেদিকে যাওয়া হলো না। বললাম, 'অন্য দ্রষ্টব্য দেখা যাক।'

আবার ফুরনে ট্যাকসি ভাড়া করে পাঁচজনে চললাম, জুবিলি পার্ক, হ্রদ ও দোমোহনির উদ্দেশ্যে। ট্যাকসি-ড্রাইভার পাঁইয়াজী ওরফে সর্দারজী বললে, 'দোমোহনিমে ক্যা হ্যায় ?'

সত্যিই তো। 'ক্যা হ্যায়।' বললাম, 'পিনটু, ওখানে কি আছে ?'

পিনটু বললে, 'খড়কাই নদী আর সুবর্ণরেখা মিশেছে। চমৎকার জায়গা।'

সর্দারজী তা জানতো ; কিন্তু সমগ্র দৃশ্যটি যে মনোরম ও আনন্দদায়ক তা সে স্বীকার করতে পারে নি।

গাড়ি প্রথমে এলো জুবিলি পার্কে—স্তরে স্তরে বাগানটি ওপর দিকে উঠে গেছে। নানা রঙের গোলাপের বন, পদ্মহীন পদ্মবন, হরেক রকমের ছোট বড় গাছ ও সবুজ মখমলের মতো ঘাসে ছাওয়া সুবিশাল বাগানখানি ভরা, মাঝে মাঝে জলাশয় ও ফোয়ারা। সেগুলির ধারে এবং মাঝে মাঝে বিজলী-আলোর ব্যবস্থা। দেওদার তরুগুলির আগা ছাঁটা। ওঁরাও ও মুণ্ডা মেয়েরা রাঙাপেড়ে শাড়ীর গাছকোমর বেঁধে, মাথায় ঘন কালো চুলের এলোখোঁপা এঁটে সহাস্যে কাজ করছে। তাদের নিটোল হাতে রঙিন কাচের চুড়ি। প্রখর রোদ ও শ্রমে রগ বেয়ে ঘাম ঝরছে, কপাল ও গাল চক্‌চক্ করছে।

পিনটু বললে, 'রাত্রে ঐ আলোগুলো জ্বলে, ফোয়ারায় প্রতিবিম্বিত হয়। তখন রামধনু, মানে সাতরঙের খেলা চলে।'

কিন্তু সে দৃশ্য কল্পনায় আনা ছাড়া সেই চাঁদি-ফাটানো বিহারী রোদে আর উপায় কিছু ছিল না। আবার বললে, 'ঐ দেখুন, ঐসব জায়গা থেকে ইলেকট্রিক বালব চুরি করে নিয়ে গেছে।'

সেখান থেকে বেরিয়ে গেলাম হ্রদের ধারে। হ্রদের আকার ডিম্বাকৃতি, মাঝে তরুকুঞ্জভরা একটি দ্বীপ। হ্রদে প্রচুর মাছ, জায়গায় জায়গায় ঘাই দিচ্ছে। শুনলাম, শিকারীদের টিকিট দেওয়া হয়।

হ্রদটিকে স্বাভাবিক মনে হলো। তাকে বেষ্টন করে পথ—তরুশোভিত রাজপথ। ইচ্ছা থাকলেও তরু-ছায়ায় বসার সময় হলো না। ট্যাকসিতে উঠে চললাম দোমোহনির দিকে।

পথে এক জায়গায় পড়লো এয়ারফিল্ড, টাটার নিজস্ব। গোটা টাটানগরই টাটা কোম্পানির। নগরে ব্যক্তিগত মালিকানার বাড়ি-ঘরের সংখ্যা বেশি নয়। তাই নগরটি পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়ে উঠেছে।

যেতে যেতে দেখা গেল হাট। দেহাত থেকে হাটুরেরা দলে দলে বেসাতি নিয়ে বয়ে এনেছে ও আনছে। আবার, তারি কাছাকাছি বসেছে পুজোর মেলা। তাই লোকে লোকারণ্য। কিন্তু তারা প্রায় সকলেই দেহাতী, মেয়ে-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ। এ দিককার দৃশ্যও বন্য, গ্রাম্য ও অগোছালো। সেটা ছাড়িয়ে এসে পড়লাম, ঘন ছায়া-ঢাকা নাতিবৃহৎ শালবনে। গাছগুলোর

কাণ্ড ও জায়গাটির অবস্থা দেখে ধারণা না হয়ে যায় না যে, এটি প্রাকৃতিক অরণ্য নয়, মনুষ্যকৃত। তার মধ্য দিয়ে অ্যাশফালট-বাঁধানো পরিষ্কার পথ। পথটি হঠাৎ শেষ হয়েছে নদীর ভাঙা ঘাটে। ট্যাকসি থেকে নেমে গিয়ে দাঁড়ালাম সেখানে।

বাঁ-দিক থেকে শিলাময় ও শ্যামল-অরণ্য-ঢাকা পথ বেয়ে আসছে খড়কাই। সমুখের দিক থেকে ঘন অরণ্যের মাঝ দিয়ে বেরিয়ে আসছে সুবর্ণরেখা। তার ধারাটি খড়কাইয়ের চেয়ে প্রশস্ততর। দুটিতে এমন ভাবে মিশেছে যেন এ মিলনে ক্ষোভ নেই, দুঃখ নেই, আছে প্রশান্তি। তাদের কূলভরা রাঙা বালু আর বুকভরা ইস্পাত-নীল শীতল জলধারা। সুবর্ণরেখার ওপর দিয়ে ধীরে একখানি খেয়া ওপারের দিকে যাচ্ছিল। দুটি নদীরই পারের দৃশ্য চোখ-জুড়ানো—ঘন সবুজ শব্দহীন বন। রোদ পড়ে তাদের মসৃণ পাতাগুলো চিক্‌চিক্ করছে।

রণজিৎ হঠাৎ বলে উঠলো, 'ঐ—ঐ—'

'কী? কী?'

'ঐ—ঐ। সেই মেমগুলো। ওরাও এসেছে। আরও কয়েকটা জুটেছে—সব এক প্যাটারন্।'

তারাও আমাদের লক্ষ্য করছিল। হয়তো ভাবছিল, 'সেই কালা আদমির দল।'

ইচ্ছা থাকলেও সেখানে বসার সময় হলো না। আবার ট্যাকসিতে চেপে ফিরে চললাম, পিনটুদের বাড়িতে। যখন পৌঁছলাম তখন বেলা এগারোটা। দোতলা ঘরের জানলা দিয়ে দেখলাম, কিছু দূরে খড়কাই নদী। ওর ওপারে ঘন বন, তারপর ধূমল শৈলমালা। তাও বনে ঢাকা। সুন্দর শান্ত দৃশ্য। কিন্তু চারজনেই ভাবছি, কি উপায়ে ঠিক সময়ে রাঁচি পৌঁছবো। পথে যেতে যেতে ঘাটের দৃশ্য দেখা কপালে নেই। এমন সময়ে নিচে বহির্দ্বারে 'ভোঁক্—ভোঁক্—'

ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে সকলে দেখলাম, সেই ট্যাকসিখানা এসেছে। কয়েকজন নেমে গেলেন। ড্রাইভারের সঙ্গে তাদের যে সব কথাবার্তা হলো তা বাদ দিয়ে লিখি, সে ষাট টাকাতেই পুরনো পথ ধরে ঘাটের ওপর দিয়ে আমাদের নিয়ে যাবে এবং পথে দু-একটা সওয়ারিও তুলবে। তবে সে নিজে গাড়ি চালাবে না, লোক দেবে। একজনকে তার সঙ্গে এই গাড়িতেই যেতে হবে; তিনিই লোকটিকে নিয়ে এই গাড়িতেই ফিরবেন। শ্রীমান পিনটুকেই পাঠানো হলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ফিরে এলো। তারপর তারা দুভাই কোথায় যে হাওয়া হয়ে গেল, বুঝতেই পারলাম না।

আমরা পেট ভরে খেয়ে যখন রওনা হলাম, বেলা তখন বারোটা বেজে কুড়ি মিনিট। রাঁচিতে যে ঠিক সময়ে পৌঁছে লোহারডাগার ট্রেন ধরতে পারবো তাতে আর সন্দেহ কী? কিন্তু তখন তখন যদি জানতাম পথে আমাদের জন্যে কী বিপত্তি অপেক্ষা করছে তা হলে কারো মুখে হাসি ফুটতো না!

(ক্রমশঃ)

দুর্বাসার পরাজয়

কৌশিক চট্টোপাধ্যায়

—এক—

দুর্বাসার নাম তোমরা সবাই শুনেছ। যেমন তাঁর তেজ, তেমনি তাঁর ক্রোধ। মানুষ তো দূরের কথা, দেবতারা পর্যন্ত তাঁর ভয়ে থরহরি কম্পমান। সেই দুর্বাসাকে একবার কি রকম নাজেহাল হতে হয়েছিল, সে কাহিনী বলছি, শোন।

দীর্ঘকাল তপস্যা করলেন দুর্বাসা। মুনির তপস্যা—সে কী সাধারণ ব্যাপার? যুগের পর যুগ চলে গেল—তারপর অনেক অনেক কাল পরে, তপস্যার শেষ হোল। পুণ্যতোয়া নদীর জলে স্নান করে দুর্বাসা শমী বৃক্ষের ছায়ায় এসে বসলেন।

তপস্যা তো হোল, এবার গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করতে হবে ভাবলেন মুনি। কিন্তু তাঁর না আছে ধন-সম্পদ, না আছে প্রাসাদ-ঐশ্বর্য। কে তাঁকে কন্যাদান করবে? ভাবতে ভাবতে বেলা গড়িয়ে গেল, প্রায় নিরাশ মনেই দুর্বাসা উঠে দাঁড়ালেন। এমন সময় দেখলেন—বনপথ দিয়ে এক উজ্জ্বল দীর্ঘকায় পুরুষ হেঁটে আসছেন। সঙ্গে তাঁর এক অপরূপ সুন্দরী তরুণী।

দুর্বাসা এগিয়ে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন। উজ্জ্বলকান্তি পুরুষ বললেন—'আমার নাম ঊর্ধ মুনি। এটি হচ্ছে আমার কন্যা। আমিও দীর্ঘকাল জপ-তপ করে কাটিয়েছি, কিন্তু আমার এই কন্যাটিকে পাত্রস্থ না করা পর্যন্ত আমার মনে শান্তি নেই।'

দুর্বাসা একটু উসখুস করতে লাগলেন। তারপর বলেই ফেললেন তাঁর মনের কথা—'মুনিবর,

কিছু যদি মনে না করেন তো বলি। আমি সংসার-আশ্রমে প্রবেশ করব স্থির করেছি। আপনি যদি অনুমতি দেন, তবে আপনার কন্যাটিকে আমি গ্রহণ করতে রাজী আছি।'

'সে তো আমার পরম সৌভাগ্য।' ঊর্ব মুনি মহানন্দে দুর্বাসার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করলেন।

দুর্বাসা তো অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সংসার পাতলেন। ভুলেই গেলেন তাঁর জপ-তপের কথা। কিন্তু হাজার হোলেও মুনি তো, কতদিন আর ভুলে থাকবেন? একদিন তাঁর মনে হোল—এ তিনি কী করছেন? কোথায় গেল তাঁর পূজা-অর্চনা ধ্যান-ধারণা! বিবেকে যেন বৃশ্চিক-দংশন হোল।

এরপর দুর্বাসা নির্জনে বসে একটু একটু তপস্যা শুরু করলেন। কাউকে বললেন না সে কথা। এমন কি নিজের স্ত্রীকেও না।

একদিন ঊর্ব-কন্যা স্বামীকে খুঁজতে খুঁজতে বনের ভেতর এসে দেখলেন, দুর্বাসা স্থির হয়ে বসে আছেন। মুনি ঊর্ধ্বনেত্র, দেহ প্রস্তরমূর্তির মত নিষ্কম্প! ঊর্ব-কন্যা কেমন যেন ভয় পেলেন। মৃদুস্বরে ডাকলেন স্বামীকে।

একেই দুর্বাসা মুনি, তায় আবার অসময়ে ধ্যান ভাঙ্গা! অজ্ঞাতসারেই মুনির দু'চোখ দিয়ে ক্রোধের আগুন ঠিকরে বেরিয়ে এলো। সাধারণ মানুষের সাধ্য কী সেই তেজের সামনে দাঁড়ায়! চক্ষের নিমেষে ঊর্ব-কন্যা ভস্মীভূত হয়ে গেলেন।

তৎক্ষণাৎ দুর্বাসার সম্বিৎ ফিরে এলো। তিনি 'হায় হায়' করে উঠলেন।

এত তপস্যা করেও ক্রোধের অগ্নিকে সংহত করতে পারলেন না?

জপ-তপ সব ছেড়ে দিয়ে দুর্বাসা মনের দুঃখে ঘুরে বেড়ান। এদিকে কিছুদিন পরে ঊর্ব মুনি এসেছেন কন্যার সঙ্গে দেখা করতে। দুর্বাসার মুখে সব শুনে তিনি দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন—'তুমি আমার কন্যাকে হত্যা করেছ। তুমি হত্যাকারী! মুনি বলে, তাপস বলে, তোমার খুব অহংকার! আমি অভিশাপ দিচ্ছি—সে অহংকার তোমার চূর্ণ হবে! অম্বরীষ রাজার কাছে তোমার পরাজয় ঘটবে।'

—দুই—

সূর্যবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা অম্বরীব। প্রবলপরাক্রান্ত, কিন্তু অন্তরে পরম বৈষ্ণব। বাইরে করছেন রাজকার্য, আর মনে মনে করে চলেছেন বিষ্ণুর চরণবন্দনা! সব রকম তিথিব্রত তিনি ভক্তিভরে উদ্‌যাপন করেন। সেই যুগে তাঁর চেয়ে বড় বিষ্ণুভক্ত পৃথিবীতে কেউ ছিল না।

একদিন অম্বরীষ একাদশী উপবাসের শেষে, দ্বাদশীর দিন যথারীতি দান-ধ্যান করলেন। তার পর উপবাস ভঙ্গ করতে যাবেন এমন সময় 'হরি ওঁ হরি ওঁ' বলতে বলতে দুর্বাসা মুনি রাজপ্রাসাদে এসে উপস্থিত। তাঁর মেঘ-মন্দ্র কণ্ঠস্বরে সারা রাজপ্রাসাদ কেঁপে উঠল। রাজা অম্বরীষ তাড়াতাড়ি

নীচে ছুটে এলেন। দুর্বাসাকে দেখে সশ্রদ্ধ প্রণাম করে অম্বরীষ বললেন—'গত জন্মে আমি কতই না পুণ্য করেছিলাম। আজ তাই এই শুভক্ষণে আপনার চরণধূলিতে আমার প্রাসাদ ধন্য হোল। এখন বলুন, আপনার জন্য আমি কী করতে পারি?'

দুর্বাসা রাজাকে আশীর্বাদ করে বললেন—'আমিও একাদশী উপবাস করেছি, আজ দ্বাদশী তিথিতে তোমার এখানেই আহার্য গ্রহণ করব।'

'এর চেয়ে সৌভাগ্য আমার আর কী হতে পারে? আপনি দয়া করে একটু বিশ্রাম করুন, আমি সব ব্যবস্থা করছি।'

'কিছুই ব্যবস্থা করতে হবে না রাজন্!' দুর্বাসা হেসে বললেন—'মুনির আহার—কয়েক টুকরো ফলমূল! আমি নদীতে স্নান করে আসি। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করো।'

দুর্বাসা চলে গেলেন নদীতে অবগাহনের জন্য।

গেলেন তো গেলেনই, আর ফেরার নাম নেই। এদিকে সূর্য প্রায় অস্তগামী—অম্বরীষ পড়লেন মহাচিন্তায়! দ্বাদশী তিথি প্রায় অতিক্রান্ত হতে চলেছে। শাস্ত্রে আছে দ্বাদশীর দিন যদি কেউ উপবাস ভঙ্গ না করে, তবে তার একাদশী ব্রতের সমস্ত পুণ্য নিষ্ফল হয়ে যায়। কিন্তু অতিথিকে উপবাসী রেখে তো তিনি উপবাস ভঙ্গ করতে পারেন না।

তখন রাজা অম্বরীষ কুলপুরোহিত মহাজ্ঞানী বশিষ্ঠ মুনির শরণাপন্ন হোলেন। সব শুনে বশিষ্ঠ বললেন—'বৎস, শাস্ত্রের কথাই ঠিক। দ্বাদশীর দিন উপবাস ভঙ্গ না করা মহাপাপ। আবার দুর্বাসাও তোমার অতিথি, তাঁর আগমনের জন্য অপেক্ষা করাও একান্ত কর্তব্য। তুমি এক কাজ করো, যতক্ষণ দুর্বাসা না আসেন, তুমি একটু একটু বিষ্ণুর চরণামৃত পান করতে থাক। এতে তোমার ব্রতও পালন করা হবে, অতিথির প্রতিও কোন অন্যায় করা হবে না।'

বশিষ্ঠের কথামত অম্বরীষ রাজপ্রাসাদের মন্দিরে গিয়ে করপুটে তুলে নিলেন বিষ্ণুর চরণামৃত। বৈকুণ্ঠের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে দু ফোঁটা পাদোদক পান করলেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই কোথা থেকে দুর্বাসা শশব্যস্ত হয়ে, রাজার কাছে হাজির। রাজাকে কিছু পান করতে দেখে, ঘৃতাহুত অগ্নির মত প্রজ্বলিত হোলেন—'রে পাপিষ্ঠ, অতিথিকে উপবাসী রেখে তুই উপবাস ভঙ্গ করছিস? আমার জন্য একটু বিলম্ব তোর সহ্য হোল না! এ পাপের শাস্তি তোকে ভোগ করতে হবে।'

ক্রোধে, ক্ষোভে, দুর্বাসা তাঁর মাথার জটা ছিঁড়তে লাগলেন। সেই জটাজালের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো এক অদ্ভুতদর্শন দৈত্য! বিকট আকার—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুতে আগুন জ্বলছে—হাতে সুতীক্ষ্ণ খড়্গ। সেই প্রলয়ান্তক ভীম ভয়ংকর দৈত্যকে দেখে অম্বরীষ ভাবলেন তাঁর অন্তিম সময় উপস্থিত। দুচোখ বন্ধ করে বিষ্ণুর পাদপদ্ম চিন্তা করতে লাগলেন।

যাকে স্মরণ করা মাত্র, সব বিঘ্ন দূর হয়, সেই সর্ব-ভয়-হর নারায়ণ বৈকুণ্ঠ থেকে সবই

দেখছিলেন। ভক্তকে রক্ষা করার ভার পড়ল সুদর্শনের ওপর।

ক্ষণ পরেই আকাশের সূর্যকে ম্লান করে বিষ্ণু-চক্র নেমে এল। মুহূর্ত মধ্যেই খণ্ড-বিখণ্ড করে দিল বিরাটকায় দৈত্যের মাথা; তারপর তাড়া করল দুর্বাসাকে।

দুর্বাসা ছুট দিলেন। কিন্তু কোথায় যাবেন? স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, যেখানেই যান পেছনে ছুটে চলেছে সুদর্শন চক্র। ছুটতে ছুটতে পা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। জটা শ্মশ্রু অবিন্যস্ত। দর্পী তপস্বী দুর্বাসার সে কী দুরবস্থা।

দুর্বাসা ব্রহ্মার কাছে গিয়ে আশ্রয় ভিক্ষা করলেন—'আপনি আমায় বাঁচান।'

সব কথা শুনে ব্রহ্মা কেঁপে উঠলেন—'কী সর্বনাশ! সুদর্শন চক্রকে নিবারণ করতে পারে, এমন সাধ্য কার? আমি তোমায় আশ্রয় দিলে, সুদর্শন আমার চারটে মাথাকেও আস্ত রাখবে না।'

নিরুপায় হয়ে দুর্বাসা ছুটলেন কৈলাসপুরীতে। সেই শ্বেতশুভ্র আনন্দলোকে হরপার্বতী বসে আছেন। ভীত ত্রস্ত দুর্বাসা কম্পিতকণ্ঠে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা নিবেদন করলেন। মহেশ্বর একটু হেসে বললেন—'ব্রহ্মা যা বলেছেন, তা একবর্ণ অসত্য নয়। বিষ্ণু ভক্তের অধীন। ভক্তকে তিনি সর্বদা ছায়ার মত অনুসরণ করে পালন করেন। এমন বিষ্ণুভক্ত অম্বরীষ রাজাকে ধ্বংস করতে গিয়ে কী মূঢ়ের মত কাজই না তুমি করেছিলে। তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, বেদবেত্তা! কী করে তোমার এরকম মতিভ্রম হোল? রক্ষা পেতে চাও তো বৈকুণ্ঠে গিয়ে নারায়ণের শরণাপন্ন হও।'

ভয় পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে দুর্বাসা তক্ষুণি দৌড় দিলেন বৈকুণ্ঠের দিকে। একবার পেছনের দিকে তাকান, আর ছোটেন। সুদর্শন চক্র ভয়ংকর ভাবে তাঁর পেছনে লেগে রয়েছে।

দুর্বাসা বুঝলেন, বিষ্ণুর চরণ ছাড়া আর গতি নেই।

বৈকুণ্ঠ উজ্জ্বল করে কাঞ্চন-আসনে বসে আছেন বৈকুণ্ঠবিহারী। দুর্বাসা নতজানু হয়ে নারায়ণের স্তব করতে লাগলেন—'তুমি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কারণ, তুমি মহা বিরাট, ভক্তবৎসল, দীনের বন্ধু। তুমি আমাকে রক্ষা কর। হে জনার্দন, তুমি ছাড়া আর কেউ নেই যে আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে। হে মধুসূদন, তুমি প্রসন্ন হও।'

পরম আশ্বাসের সঙ্গে হেসে বিষ্ণু বললেন—'ওঠ, ওঠ, শরণার্থীকে আমি সর্বদাই রক্ষা করি। তুমি এত বড় শাস্ত্রজ্ঞ হয়েও কী করে আমার ভক্ত অম্বরীষকে অপমান করলে? তুমি তো জান, আমাতে আর ভক্তে কোন প্রভেদ নেই।

তোমায় যা বলছি, শোন। অবিলম্বে যাও অম্বরীষ রাজার কাছে। তুমি যতক্ষণ না তার গৃহে অন্নজল গ্রহণ করবে, ততক্ষণ সে উপবাসী থেকে যাবে। আর রাজা উপবাসী থাকলে আমার সুদর্শন চক্রও শান্ত হবে না।'

দুর্বাসা অধোমুখে চুপ করে রইলেন।

বিষ্ণু কথা বলছেন, আর সুদর্শন চক্র দুর্বাসার মাথার ওপর এসে ঘুরতে লাগল। ভয়ে ভয়ে সেদিকে তাকিয়ে দুর্বাসা বললেন—'প্রভু দীনবন্ধু, তোমার এই চক্রটিকে একটু বন্ধ করে রাখ। আমি এক্ষুণি যাচ্ছি রাজপ্রাসাদে।'

হরিনাম জপতে জপতে দুর্বাসা বেরিয়ে পড়লেন।

মুনিকে দেখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে রাজা বললেন—'আপনার পথ চেয়ে আমি বসে আছি। আপনি আমার গৃহে উপবাস ভঙ্গ না করলে, আমিও উপবাসী থেকে যাব। তাতে যদি আমার মৃত্যুও হয়, তাও ভালো।'

ব্রাহ্মণের ক্রোধ! দপ্ করে জ্বলে ওঠে, আবার ফস্ করে নিভে যায়। দুর্বাসা তখন পরম তৃপ্তিতে আহার্য গ্রহণ করেন। দুর্বাসার ভোজনের পর, অম্বরীষ একটু প্রসাদ তুলে মুখে দিলেন। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন দেবতারা, ভক্তজনেরা ধন্য ধন্য করে উঠল।

বিষ্ণুভক্ত রাজার কাছে পরাজয় হোল সর্বশাস্ত্রবিদ্ কিন্তু অহংকারী ক্রোধী মহামুনি দুর্বাসার।

গঙ্গাফড়িং

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

রাত্রিবেলায় তোমরা আলো জেলে পড়াশুনা করছ এমন সময় হঠাৎ টেবিলের উপর এসে উপস্থিত হল বেশ বড় রকমের একটা পোকা। সুন্দর ফিকেসবুজ তার রং, চারখানা পা এবং সম্মুখে দু'খানি হাত। হাত দুটি জোড় করে সে তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তোমরা তাকে দেখে ভয় পেয়ে গেলে হয়ত। তোমাদের পিসীমা কি দিদিমা থাকলে বলবেন—ওটা ক্ষেত্তোরের ঘোড়া।

'ক্ষেত্তোর' কে আমরা জানি না; হয়ত কোনও দেবতা টেবতা হবেন, কিন্তু তাঁর ঘোড়াটি যে বেশ চটকদার তা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

কেউ হয়ত তোমাদের বলবেন, কিছু বলিস নে পোকাটিকে, ওই ছাখ কেমন হাত জোড় করে ক্ষমা চাইছে।

কিন্তু সত্যিই সে ক্ষমা প্রার্থনা করছে না। হাত জোড় করা তার স্বভাব। তবে ঐ পোশাক এবং হাত জোড় করা দেখে প্রাচীন কালে গ্রীসের লোকেরা ওর নাম দিয়েছিল 'প্রেরিং ম্যানটিস'। ওদের ভাষায় 'ম্যানটিস' কথাটির অর্থ—ধর্মযাজক অর্থাৎ পাদ্রী সাহেব। তারা ভাবত ধর্মযাজকের মতই পোকাটি নিরীহ এবং সে মধ্যে মধ্যে হাত জোড় করে আকাশের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে।

কিন্তু এর চাইতে বড় ভুল আর কিছু হতে পারে না। পোকাটির ঐ ভাবে ভালোমানুষী দেখানো ভণ্ডামি মাত্র। যে হাত দুখানিকে প্রার্থনা করছে বলে মনে হয়—ও দুটি বাস্তবিক পক্ষে মারাত্মক অস্ত্র। এ অস্ত্রের ধারে কাছে এরা যাকে পায় তার প্রাণ সংহার করে। ব্যাঘ্রের মত সে ভয়ংকর এবং পিশাচের মত নিষ্ঠুর। সে জ্যান্ত প্রাণী ছাড়া আর কিছু খায় না।

তার চেহারায় অবশ্য ভয়ংকর কিছু নেই। তার পাতলা দেহে ফিকেসবুজ রং, লম্বা দুটি ডানা। সে তার ঘাড়টিকে যে দিকে খুশি ঘুরাতে পারে। তার যেন একটা মুখমণ্ডলও আছে।

এর শান্ত চেহারার সঙ্গে সম্মুখের সাংঘাতিক পা দু'খানির বিশেষ কিছু সাদৃশ্য নেই। আঘাত করবার অস্ত্রটা লম্বা ও বেশ শক্তিশালী। উরুটা আরও লম্বা এবং ওর নীচে দুসারি ধারালো দাঁত বিদ্যমান। সংক্ষেপে বলতে গেলে ওর পা একটা দো-ফলা করাত বিশেষ। উরুর চেয়ে এতে দাঁতের সংখ্যা বেশি। এর শেষ প্রান্তে আছে সরু একটা ধারালো সূচ এবং খাঁচ-কাটা

ছুরির মত দুটি ফলা। এই অস্ত্র দিয়ে কারও হাত কি আঙ্গুল আকড়িয়ে ধরলে ছাড়িয়ে নেওয়া বেশ শক্ত। এই পোকার নাম গঙ্গাফড়িং।

গঙ্গাফড়িং যখন চুপচাপ বসে থাকে তখন ঐ অস্ত্রগুলি গুটিয়ে নিয়ে বুকের কাছে রেখে নিরীহ প্রাণীর মত ভাব দেখায়। তখন সে হাত উঁচু করে প্রার্থনা করছে বলে মনে হয়; কিন্তু যদি তখন কোন শিকার তার নিকট দিয়ে যায়, তখন আর প্রার্থনা করার ভাণ থাকে না—অস্ত্রের তিনটি লম্বা বিভাগ হঠাৎ খুলে দিয়ে এবং শিকারটিকে শেষ প্রান্তের সূঁচটি দিয়ে ধরে ফলা দুটির মধ্যে এনে ফেলা হয়। ফড়িং, ঝিঁঝি পোকা প্রভৃতিকে ধরে এই ভাবে সে মেরে খেয়ে ফেলে।

কিছু শিকার করবার মতলব যখন হয়, তখন গঙ্গাফড়িং নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে একদৃষ্টে শিকারের দিকে তাকিয়ে থাকে। উদ্দেশ্য শিকারকে ভয় দেখিয়ে অসাড় করে ফেলা। সে যেন তখন বলতে চায়—রাক্ষসের হাতে পড়েছ বাপু, আর তোমার নিস্তার নেই। শিকারও তখন পালাবার চেষ্টা করে না, বোকার মত সেখানেই বা গঙ্গাফড়িংয়ের দিকেই এগিয়ে যায়। তারপর গঙ্গাফড়িং ঐ প্রাণীটিকে আয়ত্তের মধ্যে পাওয়া মাত্র তার অস্ত্রশস্ত্র বের করে তাকে মেরে ফেলে।

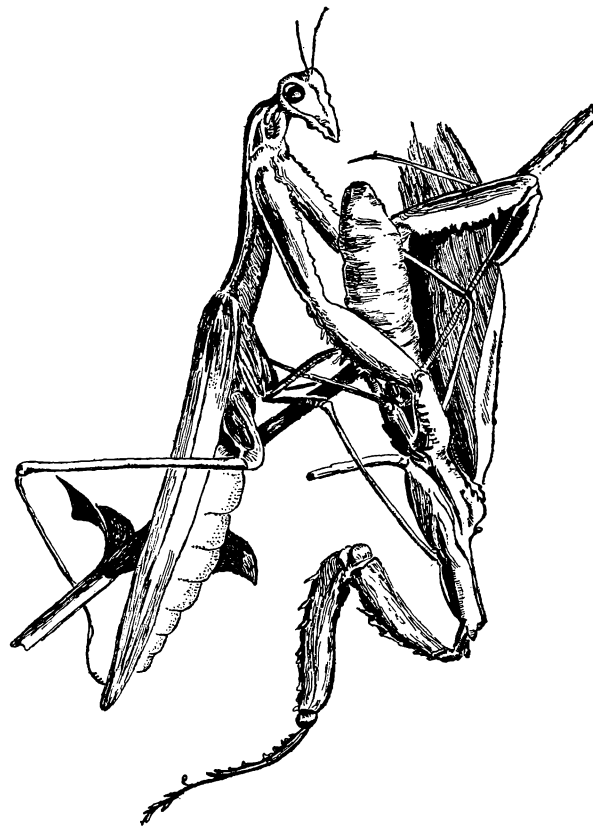

স্ত্রী-গঙ্গাফড়িং তার স্বামীকে খেয়ে ফেলছে

গঙ্গাফড়িং যতই সাধুশন্তের ভাব দেখাক না কেন আসলে সে সাংঘাতিক। স্বজাতিকে পর্যন্ত সে খেয়ে ফেলে। নিজের ভাই-বোন এমন কি স্বামীকে পর্যন্ত সে ঘাড়টি চেপে ধরে আস্তে আস্তে গিলে ফেলে। তার ডানা দু'টি কেবল গিলতে বাকি রাখে। নেকড়ের চেয়েও সে হিংস্র—কারণ নেকড়েকে কখনও আর একটা নেকড়ে খেতে শোনা যায়নি।

গঙ্গাফড়িংয়ের বাসাটি কিন্তু খুব সুন্দর। রৌদ্র লাগে এমন জায়গায় এবং যেখানে সেখানেই ওদের বাসা করতে দেখা যায়। এই বাসা এক থেকে দু' ইঞ্চি লম্বা এবং এক ইঞ্চির কম চওড়া। খোসা-ছাড়ানো গমের মত সোনালী তার রং। এক রকম ফেনার মত পদার্থ দিয়ে তৈরি হয় এই বাসা। সেটা বেশ শক্ত হয়ে যায়। ওটা পোড়ালে—সিল্ক পোড়ালে যেমন গন্ধ বেরোয়, তেমনি একটা গন্ধ পাওয়া যায়। বাসাটির উপর দিকটা কাছিমের পিঠের মত। এই বাসার মধ্যে গঙ্গাফড়িং তার ডিম পেড়েই সরে পড়ে—সন্তানের জন্যও তার কিছু মাত্র মমতা নেই।

কিন্তু এর পরিণাম হয় খারাপ। কারণ তার বাচ্চাদের খেয়ে ফেলবার জন্য অপেক্ষা করে থাকে হাজার হাজার পিঁপড়ে। যেই মাত্র বাচ্চাগুলি বাইরে মুখ বাড়ায় অমনি পিঁপড়েরা তাদের ধরে খেয়ে ফেলে। টিকটিকিও ওৎ পেতে থাকে তাদের ধরবার জন্য। এই ভাবে শত শত ফড়িং-বাচ্চার মাত্র দু'চারটে দৈবক্রমে বেঁচে যায়। যারা বেঁচে যায়, কিছু দিন পরে ঐ সব পিঁপড়ে আর টিকটিকির সাহস হয় না ওদের কাছে ঘেঁসতে। তারা তখন অস্ত্র-শস্ত্র বের করে শত্রুকে আক্রমণ করতে শিখে গেছে।

আগেকার দিনে কোন কোন দেশের লোকেরা মনে করত, গঙ্গাফড়িংয়ের ঐ বাসা ধারণ করলে সেটা হবে দাঁতের ব্যথার অব্যর্থ মহৌষধ। মেয়েরা ওটা আঁচলে বেঁধে রাখত এবং আর কারও দাঁতের ব্যথা হলে তাকে ঐ বাসাটি দু-দশ দিনের জন্য ধার দিত।

এখনও কেউ কেউ মনে করে, কোনও ছোট ছেলে পথ হারিয়ে গেলে যদি গঙ্গাফড়িংয়ের দেখা পায়, তা হলে তাকে জিজ্ঞাসা করলেই সে হাত বাড়িয়ে কোন দিকে যেতে হবে তা দেখিয়ে দেবে।

বৃথা গর্ব

ফণিভূষণ বিশ্বাস

রাতের জোনাকি বলে, "শোন তারা ভাই,— আমরাও স্বর্গে গিয়ে তারা হতে চাই।"

তারা বলে, "উপরেতে যোজন খানিক উঠিলে, নির্ঘাৎ তারা বনে যাবে ঠিক।"

জোনাকি আকাশে উঠি' গেল যে কোথায়?—
ঝড়ের দাপটে দেখ ধূলাতে লুটায়।

এ যুগের রূপকথা

(ক্রিষ্টমাসের গল্প)

'যাদুসম্রাট' পি. সি. সরকার

আমরা ভারতীয় ইন্দ্রজাল নিয়ে আবার জাপানে এসেছি। দেখতে দেখতে দু'মাস হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে আমরা জাপানের বিশটা বিভিন্ন শহরে আমাদের ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করেছি। গভর্নমেন্ট টেলিভিশনের মাধ্যমে আমাদের ইন্দ্রজাল এবারেও সারা জাপানের ঘরে ঘরে দেখানো হয়েছে। এদেশের লোকেরা নিশ্চয়ই আমাদের ভারতীয় ইন্দ্রজাল ভালবাসে, আর সেই জন্যই এরা প্রতি বৎসর আমাদিগকে আমন্ত্রণ জানায়। এবার নিয়ে আমি মোট দশবার জাপানে এলাম।

আমার সাম্প্রতিক ইন্দ্রজাল সম্পূর্ণ নাটকীয় উপাদানে গঠিত হয়েছে। দেশ-বিদেশ থেকে ছোট ছোট গল্প সংগ্রহ করে আমি আমার যাদু-নাটিকা তৈরী করি। গত বছর এবং তার আগের বারেও অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প জাপান থেকে সংগ্রহ করেছি, তার কতকগুলি রূপকথা কলিকাতায় পত্রিকাতে (শিশুসাথীতে) প্রকাশও করেছি। জাপানের রূপকথাগুলি খুবই সুন্দর। এরা অল্প কথায় অনেক বেশী প্রকাশ করে। ওদের এই তাড়াতাড়ি গল্প বলার কবিতার নাম 'হাইকু' (HAIKU)।

"স্তব্ধ পুকুর—জলের ছাপ
ব্যাঙের লাফ।"

হয়ে গেল একটা জাপানী 'হাইকু' কবিতা। এতে বলা হয়েছে পুকুরের জল স্থির ছিল—কোন রকম স্রোত ছিল না—ঢেউ ছিল না ; সেখানে একটা ব্যাঙ হঠাৎ লাফ দিয়ে পড়লো ইত্যাদি।

এরা কতকগুলি এলোমেলো কথা ছড়িয়ে দেয়—পাঠকদের সেগুলি একত্র করে গল্পটা গেঁথে নিতে হয়। এতে মনের এবং চিন্তার কিছুটা খোরাক পাওয়া যায়, কাজেই এতে অনেক রস পাওয়া যায়। কথাই আছে—"তাকে বলে আর্ট না বলা যাহার কথা ; ঢাকা খুলে বলা সে শুধু বাতুলতা।" এই জন্যই জাপানী 'হাইকু' কবিতাগুলির গল্পাংশ সহজেই সকলের চিত্তাকর্ষণ করতে পারে। আমার ইন্দ্রজালেও এই জাপানী 'হাইকু' কবিতার ধরনে একটা বড় গল্পকে ছোট ছোট কথা ও ঘটনার মাধ্যমে দেখিয়ে থাকি। যাঁরা কলিকাতা নিউ এম্পায়ার মঞ্চে আমার সাম্প্রতিক ইন্দ্রজাল দেখেছেন, তাঁরা এটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন।

বর্তমানে জাপানে আধুনিকতার ঢেউ লেগেছে। অফিসে এরা আজকাল কোট-প্যাণ্ট পরে ; নিজেদের জাপানী ভাষায় সঙ্গে সঙ্গে এরা ইংরাজী, ফরাসী, জার্মান ও রুশ—যে কোন একটা

বিদেশী ভাষা শিক্ষা করছে। ইংরাজীর প্রাধান্য খুব বেশী—তবে সেটা আমেরিকান ইংলিশ। এদেশে এখন আমেরিকায়ানা খুব বেড়ে গিয়েছে।

সেদিন এদেরকে একটা জাপানী গল্প বলতে বলেছিলাম, তারা বললো—"আমাদের রাজকন্যা কাঁগুয়া, উড়েশিমা তারো প্রভৃতির গল্প তোমাদের দেশের ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর মত পুরানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমাদের নূতন গল্প শোন—ক্রিষ্টমাসের অতি আধুনিক গল্প।"

ওরা গল্পটা বলে চললো—মোটামুটি গল্পটা এই :—

জিম নামে একটি ছেলে ছিল—সে ডেলা নামে একটি মেয়েকে খুব ভালবাসতো। দু'জনের বিয়ে হবে ঠিক হয়েছিল। ওদেশের এই-ই নিয়ম—নিজেরা দেখে শুনে নিজেদের বিয়ে ঠিক করে নেয়। জিম ও ডেলা দু'জনেই গরীব, হাতে কারুরই বেশী পয়সা জমে না। তবে কষ্ট করে ওরা কিছু কিছু জমায় যাতে ক্রিষ্টমাস উৎসবের সময় একে অন্যকে কিছু কিছু উপহার কিনে দিতে পারে। ক্রিষ্টমাসের সময় ওরা এইভাবে নিজেদের মধ্যে উপহার বিনিময় করে। জিনিসপত্র দিতে না পারলে ওরা অন্ততঃপক্ষে ক্রিষ্টমাস কার্ড পাঠিয়ে নিজেদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানায়।

একবার ক্রিষ্টমাসের সময় ডেলা মাত্র এক ডলার আশি সেণ্ট জমিয়েছে—শত চেষ্টা করেও সে তার বেশী জমাতে পারে নি। অথচ একদিন পরেই শুভ ক্রিষ্টমাস উৎসব। একদিন পরই তার প্রিয় জিম এসে তাকে 'মেরী ক্রিষ্টমাস' বলে শুভেচ্ছা জানাবে। সে তখন এই এক ডলার আশি সেণ্ট দিয়ে কোন্ উপহার কিনে নিয়ে হাজির হবে! ঐ সামান্য পয়সায় ভাল একটা 'ক্রিষ্টমাস কার্ড' ছাড়া আর কিছুই কেনা যাবে না। অথচ ডেলার ইচ্ছা ছিল যে জিমকে একটা সুন্দর সোনার ঘড়ির ব্যাণ্ড কিনে দেয়। জিমের ঘড়িটা সোনার কিন্তু তার ব্যাণ্ডটা ছিল পুরানো ছেঁড়া চামড়ার, ঐ ঘড়ির সঙ্গে ঐ 'ব্যাণ্ড' একদম মানায় না। ডেলার ইচ্ছা ছিল ঘড়ির ব্যাণ্ড কিনে দিয়ে সে জিমকে চমক লাগিয়ে দেবে। কিন্তু তার পয়সা নেই। ঘরে আয়নাতে নিজের চেহারা দেখে ডেলা আরও কেঁদে উঠলো। তার এত সুন্দর চেহারা—মাথা ভর্তি কেশগুচ্ছ—যাকে বলে আলুলায়িত কেশ—সুন্দর স্বাস্থ্য, সুঠাম গঠন। সবাই তার চেহারার, বিশেষ করে চুলের প্রশংসা করতো—অথচ সে গরীব, তার পয়সা নেই—কিছুই কিনবার ক্ষমতা নেই। হঠাৎ কি ভেবে ডেলা শীতের মধ্যেই বাইরে ছুটে বের হয়ে গেল। সামনেই একটা 'সেলুন'—সেখানে মানুষের চুল কেনা বেচা হয়। ডেলা সোজা সেই সেলুনে গিয়ে বললো—"চুল কিনবে—চুল ?"

দোকানী মহিলাটি একটু রুক্ষমেজাজী, সে উত্তর দিল—"চুল কেনা-বেচা আমার ব্যবসা। তোমার কেমন চুল বিক্রীর আছে আমাকে তাড়াতাড়ি দেখাও, আমি দাম বলে দিচ্ছি। তাড়াতাড়ি করবে। আমি ভীষণ ব্যস্ত—একদম বাজে কথা বলার সময় নেই।"

অশ্রুসজল নয়নে ডেলা তার নিজের মাথার চুল দেখালো।

দোকানী মহিলাটি দেখে বললো—"বিশ ডলার।" কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডেলার চুল কেটে নিয়ে সে ডেলার হাতে বিশ ডলার গুণে গুণে দিল।

ডেলাও যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে। সে ঐ বিশ ডলার হাতে পেয়েই সোজা ঘড়ির দোকানে ছুটে গেল। সোনার ব্যাণ্ড চাই। ভাগ্যক্রমে ঐ ঘড়ির দোকানের আলমারীতে জিমের ঘড়ির মত একটা সোনার ঘড়ি ছিল। ডেলা বললো—"এরকম ঘড়ির সঙ্গে 'ম্যাচ' করে এমন একটা আধুনিক ব্যাণ্ড চাই কুড়ি-একুশ ডলারের মধ্যে।"

ঘড়িওয়ালা বেছে বেছে একটা খুব সুন্দর ব্যাণ্ড প্যাকেট করে বেঁধে ডেলার হাতে দিল। ডেলা এবার খুব খুশী—তার প্রিয় জিমকে সে নিজের মনের মত উপহার দেবে। বাড়ী ফিরে সে আবার তার ঐ আয়নাতে মুখ দেখলো। এবার চমকে উঠলো সে। তার মাথায় চুল নেই, কি বিশ্রী লাগছে তাকে দেখতে। জিম তাকে এখন ভালবাসবে তো? ভয় কি চুল আবার তাড়াতাড়ি গজিয়ে উঠবে। সে জিমকে বুঝিয়ে বলবে—"জিম, আমি তোমার জন্য ক্রিষ্টমাসের উপহার কিনতে গিয়ে আমার চুল কেটে বিক্রী করেছি। আবার আমার চুল হবে—আমার চুল খু-উ-ব তাড়াতাড়ি বাড়ে।" মনে মনে সমস্ত কথা ঠিক করে রাখে ডেলা।

ক্রিষ্টমাসের দিন জিম হাসিমুখে এসে হাজির হলো। বললো—"ডেলা, মেরী ক্রিষ্টমাস।" এই কথা বলে সে হাত বাড়িয়ে একটা উপহারের প্যাকেট ডেলার হাতে তুলে দিল। ডেলাও হাসিমুখে "মেরী ক্রিষ্টমাস" বলে তার উপহারের প্যাকেটটি জিমের হাতে তুলে দিল। দু'জনেই ভীষণ খুশী। তারা তাদের প্রিয়জনকে ইচ্ছামত জিনিস উপহার দিতে পেরেছে। দু'জনেই পরিতৃপ্ত। হঠাৎ ডেলা বলে বসলো—"জিম, আমাকে ক্ষমা করো, আমি আমার চুল কেটে ফেলেছি। টাকা ছিল না বলে আমি চুল বিক্রী করে তোমার জন্য ঘড়ির ব্যাণ্ড কিনেছি। তোমার সোনার ঘড়ির সঙ্গে সোনার ব্যাণ্ড মানাবে খুব সুন্দর। আমার চুল খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে, আবার চুল হবে। আমি তোমার জন্যই চুল কেটে ফেলেছি, জিম।"

জিম এই কথা শুনে নির্বাক নিস্পন্দ; শেষে বললো—"ডেলা, তুমি তোমার চুল কেটে ফেলেছো? তুমি করেছ কি ডেলা!" তার চক্ষুতে ভরা বিষাদ-চিহ্ন, সে যেন কত দুঃখিত। পরে বললো—"ডেলা, তোমার বড় বড় চুল—ওতে তুমি সোনার চিরুনি পরতে চেয়েছিলে। আজ আমি আমার হাতঘড়িটা বিক্রী করে তোমার জন্য এক জোড়া সোনার চিরুনি উপহার কিনে এনেছি ডেলা। ঐ প্যাকেটে তোমার জন্য সেই চিরুনি রয়েছে।"

বাইরে তখন চারদিকে সাদা হিম-শীতল বরফ পড়ছিল।

———

বিশ্বশ্রী মনতোষ রায়

স্নেহের ভাইবোন সব,

কি খবর বল—ভাল তো সবদিক থেকে? যা দিন পড়েছে—বলার নেই কিছু।

দেশবাসী নিয়েই দেশের কাঠামো গড়ে ওঠে। সেই দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার পদ্ধতি ক্ষুণ্ণ হবার কারণ আমার যতদূর মনে হয় মনান্তর ও মতান্তর। এই দুটোকে সংশোধন করতে পারলে শান্তি ও শৃঙ্খলা আমাদের সত্যিই দাস হয়ে থাকতো, তোমরা কি বল?

যাক রাজনীতি তোমার আমার জন্য নয়, তার জন্য আলাদা লোক রয়েছেন। মোট কথা আমরা চাই সবার মধ্যে শান্তি, সুখ আর শৃঙ্খলার নবজন্ম। এই মনোভাব নিয়েই আমরা দেশকে ভালবাসবো। রাজনীতির দলাদলিতে আমরা হাত বাড়াবো না। মনে থাকবে তো?

মনে আছে—২৪শে ডিসেম্বর রোববার সন্ধ্যা ৬টায় কলকাতা মহাজাতি সদনে 'জাতীয় ভারতশ্রী', 'Mr. Muscleman of India' এবং 'Mr. Strongman of India' প্রতিযোগিতার কথা? ঐ প্রতিযোগিতা যদি তোমরা বাবা-মা ও বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে দেখতে চাও ৫৲ টাকা দিয়ে Reception Committeeর সভ্য হও, তা হলে আগে থেকে সিট ঠিক থেকে যাবে। গত মাসের শিশুসাথীতে আমার নতুন বাড়ীর ঠিকানা দেওয়া হয়েছে, সেই ঠিকানায় তোমরা তোমাদের নাম-ঠিকানা পরিষ্কার ভাবে লিখে M. O. করে টাকা পাঠিয়ে দিলে প্রবেশপত্র পাঠিয়ে দেবো। ভীষণ ভীড় হবে—দেরি করলে প্রবেশপত্র পেতে কষ্ট হবে কিন্তু।

যাক এবার তোমাদের কিছু চিঠিপত্রের জবাব দিচ্ছি। ভাদ্র মাসে ক'টি পুষ্টিকর খাবারের প্রস্তুত-প্রণালী দিয়েছি—তৈরী করে খেয়েছো তো? ব্যায়ামীরা বা শরীরের প্রতি যারা যত্ন নেয় তাদের কাছে এই খাদ্যগুলির মূল্য অনেক তো বটেই, ভালও লাগবে বেশ।

এবার খাবারের নির্দেশ কিছু দিচ্ছি না। ক'টা জরুরী ও কাজের কথার জবাব দিচ্ছি—পড়ে মনে রাখবে এবং অপরকে বলবে, তাতে শিক্ষার হার বেড়ে যাবে।

বুলবুলি রায় চৌধুরী (কলকাতা)। প্রঃ—শীতকালে তেল মালিশের প্রতি আপনি জোর বেশী দেন কেন?

উঃ—সে অনেক কারণ, গুছিয়ে বলতে গেলে মস্ত একটা প্রবন্ধ হয়ে পড়বে। সে আর চিঠির জবাবের মত লাগবে না। ছোট করে বলি, শিখে রাখ।

প্রথম কারণ—শীতকালে শরীরের চামড়া জলীয় বাষ্পের কারণে খস্‌খসে হয়ে যায়, তাতে চামড়া কখনো ফেটে ফেটেও যেতে পারে—তা হবে না। দ্বিতীয় কারণ—শরীরের রক্ত চলাচল শীতের জন্য স্বাভাবিক অবস্থা থেকে একটু কমেও যেতে পারে—তা হবে না। তৃতীয় কারণ—চামড়ার যে মসৃণতা ও চকচকে ভাব থাকা উচিত যার থেকে চামড়ার ভেতরকার অতি ক্ষুদ্র স্নায়ু ও পেশী-কোষগুলির কর্মক্ষমতা বুঝতে পারা যায়—সব কিছুই বজায় থাকে। চতুর্থ কারণ—শীতকালের রোদে চামড়া কালো হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে বেশী—তেল মালিশ করলে চামড়া রোদে পুড়ে যায় না। পঞ্চম কারণ—বুকে পিঠে ঠাণ্ডা লাগার সম্ভাবনা থাকে বেশী শীতকালে। সর্দি-কাশি কম হবে মালিশ করলে, নাকে কানে তেল দিলে আরও অনেক ভাল উপকার পাওয়া যায়। ষষ্ঠ কারণ—ঠিক প্রথামত যদি মালিশ কারো কাছ থেকে নেওয়া যায় তা হলে হজমশক্তি বাড়বে, গাঁটে গাঁটে বাত থাকলে, হাত-পায়ের জোর কমে গেলে, পেটে বায়ু-পিত্ত-অম্বল হলে, কোষ্ঠ-কাঠিন্য হলে, স্নায়বিক দুর্বলতা থাকলে, পেটের কোন গণ্ডগোল থাকলে, এমন কি রোগা মোটা হতে চাইলে বা মোটা রোগা হতে চাইলে এই মালিশ-পদ্ধতি দিয়ে সেসব সন্তোষজনক ভাবে সমাধান করা যায়—বুঝলে ?

বল্লাল সেন (এলাহাবাদ)। প্রঃ—শীতকালে ব্যায়ামচর্চার প্রতি আপনারা উৎসাহ দেন কেন বেশী ?

উঃ—ঐ উপরের উত্তরের মতই হবে। তবে শেষ কথা জেনে রাখ—শীতকালে কম বেশী সব রকম খাদ্যই বেশ তাজা পাওয়া যায়। তা ছাড়া হজমও হয় তাড়াতাড়ি, একটু বেশী সময় ব্যায়ামচর্চা করলেও ক্লান্তি আসে না, শীতকালের বায়ুতে দূষিত জিনিস কম থাকে। এসব কারণেই বলা হয় যেন শীতকালে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু ব্যায়াম-আসন নিয়মিত অভ্যাস করে, বুঝলে ?

অমিতা দত্ত (পাটনা)। প্রঃ—মেয়েদের পক্ষে যোগাসন ভাল কি ব্যায়াম ভাল ?

উঃ—প্রশ্নটা ঠিকমত করতে পারনি তবে আমি বুঝতে পেরেছি। যাদের শরীরে ব্যায়াম করার মত শক্তির অভাব তাদের পক্ষে যোগাসন একান্তই দরকার। নচেৎ যোগ ও ব্যায়াম দুইই সামঞ্জস্য রেখে করা চলে, তাতে সৌন্দর্য কমে না, বরং বাড়ে।

অনিমেষ বসু (আসাম)। প্রঃ—অত রেগে যাই কেন বলতে পারেন ?

উঃ—পারি, ঠিক সেই মুহূর্তে একমনে ৩০-২৯-২৮ এমনি ভাবে ১এ এসে থেমে দেখবে রাগ বিদায় নিয়েছে।

বসুমতি ব্যানার্জি (লক্ষ্ণৌ)। প্রঃ—শশঙ্গাসন আর ধনুরাসনে কি লম্বা হওয়া যায় ? স্মৃতি-শক্তি বাড়ানো যায় ? পেটের গণ্ডগোল ভাল রাখা যায় ? সৌন্দর্য ও সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় ?

উঃ—হ্যাঁ।

খোকন শেঠ (হাওড়া)। প্রঃ—ব্যায়াম ফাঁকি দিয়ে করেছি বলতে অত ভাল লাগে কেন বলতে পারেন ?

উঃ—মিথ্যাবাদী উপাধি লাভের শখ যাদের বেশী তারাই এমন করে।

রাইচরণ শেঠ (হাওড়া)। প্রঃ—জানেন বায়ু যখন ঠেলা দেয় তখন তা মাথায় গিয়ে ধাক্কা মারে, তখন মাথা থেকে এক আদেশ হয়, মাথা আমার খারাপ আর লোকেও তাই ভাবে—কি করি বলুন তো ?

উঃ—লোকের কিচ্ছু দোষ নেই—সব নিজের।

থাক আজ—আবার আসছে মাসে হবে, কেমন ? ভালো থেকো। ইতি

—তোমাদের মনতোষদা

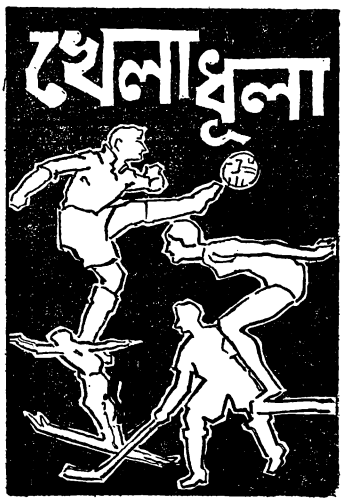

শ্রীঅমিতাভ

বিধাতার জীবনের স্কোর বুকে লেখা হল—কোট্টারি কনকাইয়া নাইডু ৭২। জীবনের অনেক খেলায় সেঞ্চুরী করেছেন, কিন্তু জীবনের খেলায় বাহাত্তরের কোঠায় পৌঁছেই বিদায় নিলেন তিনি। দুটি অক্ষর সি. কে. ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। ৬২ বছর বয়স পর্যন্ত সি. কে. মাথা উঁচু করে মাঠে নেমেছেন। শেষের দিকে যেখানেই খেলেছেন সেখানেই পেয়েছেন অধিনায়কের সম্মান। তাঁর হাতে গড়া খেলোয়াড় মুস্তাক এবং সি. এস. ভারতীয় ক্রিকেটের উজ্জ্বল রত্ন।

সাত বছর বয়সে ক্রিকেট ব্যাট হাতে নেন সি. কে. আর ৬২ বছর বয়সে তা নামিয়ে রাখেন। এর মাঝে ছড়িয়ে আছে তাঁর নানান অমর কীর্তি, তা আজ ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাস। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং এবং দল পরিচালনায় ক্রিকেটের সর্বক্ষেত্রে সি. কে. ছিলেন অতুলনীয়। সি. কে. ছিলেন আবার ওভার-বাউণ্ডারী বিশারদ।

ভারতীয় ক্রিকেটের প্রথম দিকে চতুর্দলীয় খেলাই ছিল বিখ্যাত। সেই সময় সি. কে. বহুবার হিন্দুদলের অধিনায়কত্ব করেন। টেস্ট ক্রিকেটের স্বাদ ভারত পেয়েছে অনেক পরে, তাই ১৯৩২ সালে ইংলণ্ড সফরের জন্য সি. কে. যখন নির্বাচিত হন তখন তাঁর বয়স ৩৭ বৎসর। তিনি সবসুদ্ধ সাতটি টেস্টে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ লাভ করেছেন।

ভারত সফরকারী এম. সি. সি.র বেসরকারী দলের বিপক্ষে বোম্বাইয়ের খেলা সি. কে.র জীবনের

বোধ হয় অন্যতম স্মরণীয় ম্যাচ। এম. সি. সি. দলে মরিস টেট, জর্জ পিয়ারী, অ্যাসটিটের মত সব বাঘা বোলার। খেলতে নামলেন সি. কে.; এই কালো ছেলেটির উইকেট নেবার জন্য এম. সি. সি.র বোলারদের প্রাণপণ চেষ্টা। কিন্তু ব্যাটের নিপুণ চালনায় রানের বন্যা। আউট হলেন তিনি; কিন্তু সেঞ্চুরীর মালাটি পরে। একশত মিনিটে করলেন ১৫৩ রান; এর মধ্যে এগারটি ওভার-বাউণ্ডারী এবং তেরোটি বাউণ্ডারী।

গত ১৪ই নভেম্বর ইন্দোরে সি. কে নাইডুর শেষকৃত্য সমাপণ হল। ভারতীয় ক্রিকেটের এই অবিস্মরণীয় নায়কের স্বর্গত আত্মার আমি শান্তি কামনা করি।

গত বছর ডেভিস কাপের খেলায় ভারত শেষ পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছিল। কিন্তু এবার আন্তঃআঞ্চলিক খেলার প্রথম ধাপেই দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ভারত পরাজিত হয়েছে ৫—০ খেলায়। খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় স্পেনের বার্সিলোনাতে। ভারতের একমাত্র ভরসা ছিল রমানাথন কৃষ্ণান কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার বব হিউয়টের এবং ড্রাইসডেলের বিপক্ষে কৃষ্ণান সুবিধে করে উঠতে পারলেন না।

ভারতীয় ক্রিকেটদল অস্ট্রেলিয়ায় উপনীত হয়েছে এবং ইতিমধ্যে দুটি খেলাতে অংশগ্রহণও করেছে। সফরের উদ্বোধনী খেলায় ভারত জয়ী হয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় খেলাতে পরাজিত হয়েছে। উদ্বোধনী খেলাটি ছিল একেবারে মামুলি ধরণের; কিন্তু পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে দ্বিতীয় খেলাটি একেবারে পুরোপুরী প্রথম শ্রেণীর খেলা। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া ইতিপূর্বে ১৯৪৮ সালে ভারতীয়দলকে ছয় রানে পরাজিত করে এবং ওয়েস্ট-ইণ্ডিজদলকে ১৯৫১ সালে এক ইনিংস এবং ১৯৬০ সালে ৯৪ রানে পরাজিত করে। এবার ভারতীয়দল এক ইনিংস এবং কুড়ি রানে পরাজিত হয়েছে। পায়ের পেশী সংকোচনের ফলে ফিল্ডিং করার সময় অধিনায়ক পতৌদি অবসর গ্রহণ করেন। পতৌদি বলেছেন যে তাঁর কোন ভাল ফাস্ট বোলার নেই বলে খুবই অসুবিধে হচ্ছে। ম্যানেজার প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় গোলাম আমেদ বলেন যে ভারতীয় দলের খেলোয়াড়েরা অস্ট্রেলিয়ায় এই প্রথম খেলছে, ফলে তাঁদের আবহাওয়া এবং পিচের সঙ্গে অভ্যস্ত হবার সুযোগ দিতে হবে।

বোম্বাইয়ে রোডার্স কাপের খেলা শুরু হয়েছে। এই লেখা প্রস্তুত করার সময় পর্যন্ত কলকাতার দুটি দল মাত্র বোম্বাইয়ের মাঠে অবতীর্ণ হয়েছে। মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলের খেলা এখনও হয় নি। মহামেডান কোয়ার্টার ফাইন্যালে উঠেছে, ভারতীয় নেভী দলকে ৩—২ গোলে পরাজিত করে। কিন্তু অন্ধ্র পুলিসের কাছে ১—০ গোলে পরাজিত হয়েছে বি. এন. রেলদল।

নতুন ধাঁধা

রন্টু চ্যাটার্জী

(১)

তিন অক্ষরে নাম মোর উড়িতে সমর্থ,
দ্বিতীয় ছাড়িলে আমি খনিজ পদার্থ।
প্রথম অক্ষর চলে,
শেষের অক্ষর বলে।
বল দেখি একথার কি হইবে অর্থ?

(২)

চাঁদের মতন মুখটি তার,
গায়ে দাগ এক হাজার।
চরণ বিনা চলে রাজার প্রিয় ছেলে!
বছর বছর বাড়ে সে,
বল দেখি সেটি কে?

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

মাথা বিশাল

উত্তরদাতাদের নাম

দুইটি উত্তর ঠিক হয়েছে – চন্দ্রশেখর, কল্পনা, দেবদাস প্রভৃতি (হুগলী); দেবল ব্যানার্জ্জী (কলিকাতা); ব্রজকিশোর রায় (২০৭২৩); ভুতুন, ভুতনী প্রভৃতি (বর্দ্ধমান); খুকু, কালু, ভুতো (মেদিনীপুর); শুভা দাসগুপ্ত (১৮৫০২); সমিতা সরকার (২০৪৩৬); রেখা ও কাঞ্চন চক্রবর্ত্তী (বীরভূম); বিচিত্র গুপ্ত (১৮৬৭৮); গৌর, বুবু, শিবু প্রভৃতি (মেদিনীপুর); অর্চ্চনা ও বন্দনা মুখার্জ্জী (১১৫২৩); শিপ্রা ভট্টাচার্য্য (১১৪০৫); গৌরকিশোর দাস (২০১৭৫); বিশ্বজিৎ ও আশীষ মিত্র, বিবেকানন্দ মুখার্জ্জী (১০৭৯৬); কৃষ্ণেন্দু রায় (হাওড়া); অশোক চক্রবর্ত্তী (২০৫৫৭); ভবানী ও মিনতি (যশপুর); নবকুমার মণ্ডল (হরিদাসপুর); বিবু, তনু (কলিকাতা); চূড়ামণি, প্রতিভা ও জয়দেব (বীরভূম); কাঞ্চনকান্তি দে (টাকী); নাজমা, মবীন, পাপু প্রভৃতি (মুর্শিদাবাদ); টলি, লীনা, পলি প্রভৃতি (বীরভূম); তন্ময় ও শাশ্বতী (১৯৫৭৯); কৃষ্ণা, ঝর্ণা, স্নিগ্ধা, সলিল (২০৩৭১); ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায় (১৯৪১৮); রানু চক্রবর্ত্তী (কলিকাতা); পল্লব চৌধুরী (১৫৫২৮); মঞ্জিনী মুকুল মুখার্জ্জী (১৮৯৮২); গৌতম ও শান্তনু রায় (২০৯৭১); স্বপন, শম্ভু, বাবু লাহিড়ী (২০১৬৯); সুরথ, পঙ্কজ ও সুচেতা (১৯৮৪৬); রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি (হাইলাকান্দি); রুপালী ভট্টাচার্য্য (কলিকাতা-৮); রজত ও রন্টু ভট্টাচার্য্য (২০৩৮৯); লীনা, মীনা, তপন প্রভৃতি (কলিকাতা-৩২); অধীর বৈদ্য ও বিধান রায় (২৪ পরগণা); সমরেন্দ্র ও সুশান্ত সাহা (২৪ পরগণা); মানিকলাল পাল (মেদিনীপুর); কুমারী ভারতী দাঁ (২০৪৫৪); দিলীপ, দীপালী ও শেফালী ঘোষাল (১১৮০৯); মিহির ও সুবীর ভট্টাচার্য্য (জামসেদপুর)।

একটি উত্তর ঠিক হয়েছে—বীরবাহু সাহা (১৫৩৯১); কল্যাণপ্রকাশ গুপ্ত (হাওড়া); সীমা চৌধুরী (বীরভূম); কামাল হোসেন (২০১১৬); মদন, প্রদীপ ও প্রভাতী (বীরভূম); শৈবাল পুরকায়স্থ (২০৫৩১); নাসের হোসেন ও সোনালী বেগম (বহরমপুর); সুস্মিতা ব্যানার্জ্জী (১৪৪০২); রঞ্জু, অঞ্জু, মঞ্জু প্রভৃতি (বারাসত); সুব্রত, ইলা, শর্ম্মিষ্ঠা প্রভৃতি (বেহালা)।

ছোটো বন্ধুরা,

হিমানী হাওয়ার ছোঁয়ায় শীতের আগমনী বেশ বোঝা যাচ্ছে। বাৎসরিক পরীক্ষা আর পৌষমাসের পিঠে, পায়েস— শুরু হয়েছে দুটোই।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে যে রাজনৈতিক পালা বদলের জের চলেছে, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, তাতে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমাদের ছাত্র সমাজ আর তাদের ভবিষ্যৎ। রাজনীতি যখন পবিত্র শিক্ষামন্দিরের দিকেও হাত বাড়ায়, তখন সাময়িক উন্মাদনা হয়ত কিছুসংখ্যক স্বার্থান্বেষীকে তুষ্ট করতে পারে; কিন্তু দেশের সত্যিকারের দরদী যাঁরা তাঁরাই বুঝবেন, শেষ পর্যন্ত এর ফল শুভ হয় না। আজ সমস্ত পশ্চিমবাংলার ছাত্র-ছাত্রীদের যে অনির্দিষ্ট অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে চলতে হচ্ছে, তাতে শেষ পর্যন্ত সর্বভারতীয় কোন পরীক্ষা অথবা শিক্ষার ব্যাপারে তারা তো উপযুক্ত সময়ে যোগই দিতে পারবে না। সবগুলি পরীক্ষা পিছিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি কবে যে সেগুলি অনুষ্ঠিত হবে, তা নিশ্চয় করে বলা মুশকিল। তবে এটুকু ভাল যে অধিকাংশ বিদ্যালয়েই নানা বাধাবিঘ্নের মধ্যে দিয়েও বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পেরেছে।

এবছর যাঁদের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব পালন করা হল, তাঁদের অন্যতম বিজ্ঞানী মাদাম কুরী। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর পোল্যাণ্ডের ওয়ারশ শহরে তাঁর জন্ম। তাঁর পুরো নাম মারিয়া স্কলোদোভস্কা। তাঁর পিতা ছিলেন গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক। মারিয়া সুবিখ্যাত সর্বন (Sorbonne) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে পদার্থবিদ্যায় এবং ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে গণিতে মাস্টার ডিগ্রী লাভ করেন। ফ্রান্সের প্রতিভাবান বিজ্ঞানী পিয়ের কুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। কুরীদম্পতি ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রেডিয়াম আবিষ্কার করার কথা ঘোষণা করলেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁরা সুবিখ্যাত নোবেল পুরস্কার পান। রেডিয়াম আবিষ্কার করে দুর্গত রোগক্লিষ্ট মানুষের নিরাময়ের একটা পথ তাঁরা খুলে দিয়েছেন। লোভনীয় নানা রকম প্রস্তাব আসা সত্ত্বেও তাঁরা রেডিয়ামের 'পেটেণ্ট' নেন নি। অথচ ইচ্ছা করলেই রেডিয়ামের 'পেটেণ্ট' করে নিয়ে তাঁরা ধনী হতে পারতেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে পিয়ের কুরীর আকস্মিক মৃত্যুতে মাদাম কুরীর মন একেবারে ভেঙ্গে পড়ে।

তার পরেও তিনি তাঁর অনলস বিজ্ঞান সাধনা করে যান। পিয়ের কুরীর অধিষ্ঠিত সর্বন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপকের পদ তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার নোবেল পুরস্কার পান মাদাম কুরী। দুঃখ, দারিদ্র্য, অমানুষিক পরিশ্রম, শোকের আঘাত সব কিছু হাসিমুখে সহ্য করে এই মহিমময়ী বিজ্ঞানসাধিকা তাঁর দুরূহ সাধনায় মানবজাতির পরমতম কল্যাণ করে গেছেন। দীর্ঘকাল রেডিয়াম নিয়ে গবেষণা করায় তাঁর দেহ শেষ পর্যন্ত তেজস্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিল। নিজের নিরাপত্তার দিকে তিনি মন দেন নি। শেষ পর্যন্ত রেডিয়ামের বিষক্রিয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়। এই পরম কল্যাণী মানবহিতৈষী বিজ্ঞান-সাধিকাকে তাঁর শতবার্ষিকী জন্মদিনে আমাদের প্রণাম জানাই। এঁরাই হলেন সার্থক মানবজীবনের যথার্থ আদর্শ।

আগামী ২৫শে ডিসেম্বর বড়দিন—মানবপুত্র যীশুখৃষ্টের পবিত্র জন্মদিবস। দরিদ্র পিতামাতার কোলে, কনকনে শীতের রাতে সরাইখানার এক আস্তাবলে তাঁর জন্ম। সেদিন নবজাতকের কোন যোগ্য আশ্রয়স্থল জোটে নি। পশুদের যবপাত্রে তাঁকে রাখা হয়েছিল। মানুষের মুক্তির পথ দেখিয়েছেন সেদিনকার সেই নবজাতক। আবার মানুষেরই চরম নিষ্ঠুরতায় তাঁকে মরদেহ ত্যাগ করতে হয়েছে। আজ সারা পৃথিবী শ্রদ্ধানত হয়ে তাঁকে নমস্কার করে। এই আলোকের দূত যে প্রেম, মৈত্রী ও মানবতার বাণী প্রচার করেছেন, আজকের পৃথিবী যেন তা ভুলে না যায়।

আজকের চিঠি এখানেই শেষ করি। আমার প্রীতি ও শুভকামনা নিও।

১লা পৌষ
১৩৭৪

শুভার্থিনী—তোমাদের সম্পাদিকা

——

সম্পাদিকা—শ্রীমতী দাশগুপ্ত
৫, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, শ্রীনারসিংহ প্রেস হইতে
শ্রীরামকৃষ্ণ পাল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পরিবারের সবাই খুশী

দেশী গাছ গাছড়া থেকে আয়ুর্বেদ মতে তৈরী সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহারে মুখের দুর্গন্ধ ও সর্বপ্রকার দন্তরোগ দূর হয়, দাঁতের 'এনামেল' হয় শক্তিসম্পন্ন, দাঁত হয় সুস্থ, সবল ও ঝক্‌ঝকে। মুখে ফুটে ওঠে সুন্দর হাঁসি।

সাধনা দশন

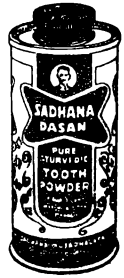

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ, সি, এস (লণ্ডন), এম, সি, এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য।

বাহির হইয়াছে ! বাহির হইয়াছে !!

সুবিখ্যাত প্রবীণ সাহিত্যিক

খগেন্দ্রনাথ মিত্রের

ভোম্বোল সর্দার

প্রথম খণ্ড ২·০০ দ্বিতীয় খণ্ড ২·৫০

●

শিশু-সাহিত্যের যাদুকর খ্যাতনামা সাহিত্যিক

স্বপনবুড়োর

সরেস সন্দেশ ৩·০০

●

বাঙলার অন্যতমা প্রখ্যাত লেখিকা

আশা দেবীর

বৃষ্টির পর রোদ্দুর ১·৫০

●

প্রখ্যাত লেখক শ্রীচারুবিকাশ দত্ত রচিত

(স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত কাহিনী)

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ৪·০০

বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স (প্রাইভেট) লিমিটেড

৫, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২